জলাঞ্জলি

তারাপদ রায়

জলাঞ্জলি

তারাপদ রায়

সাহিত্যম্ ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

JALANJALI
BY TARAPADA ROY
SAHITAM
18 B S. C. DEY STREET
CALCUTTA-700 073
PRICE Rs : 30. 00
ISBN : 81-7267-065-6

প্রথম প্রকাশ
কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৭
মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৭
নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
দেবাশীষ দেব

মুদ্রাকর ঃ
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি কলেজ রো কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ৩০.০০

উৎসর্গ

অটক ভাদুড়িকে

॥ আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ॥

সরস তারাপদ রায়

সরসতর তারাপদ রায়

স্ত্রীরত্ন

গর্জন গোয়েন্দা

ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় 'জলাঞ্জলি' বৎসরাধিক কাল হলো ধারাবাহিক বেরোচ্ছে। সেই সঙ্গে সমসাময়িক আরো কিছু রম্যরচনা যোগ করে এই বই। এই সব অবান্তর এবং হাস্যকর রচনা কেন সম্পাদকেরা ছাপেন, প্রকাশকেরা বই করেন এবং পাঠকেরা পড়েন, সে বিষয়ে আমার দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইচ এ ৫৫, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০০৯১

তারাপদ রায়
কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৭

সূচীপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
ঢাকাই রসিকতা	৯
গোলমেলে	১২
বিড়ম্বনা	১৪
সময় ও বয়েস	১৬
নাটক	১৮
পত্রসাহিত্য	২০
কৌকার কৌতূহল	২২
জনৈক নাস্তিক হিন্দু	২৪
মহা সপ্তমী : ক্যাম্প, লবণ হ্রদ	২৬
পুজোর আড্ডা আর জমে না	২৮
পরমা পার্ক স্ট্রিট	৩১
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৩৪
হাসবার কিছু নেই	৩৬
স্বামী বিবেকানন্দ	৩৮
স্বামী বিবেকানন্দ (দুই)	৪০
ওয়ার্ক কালচার ॥ ১ ॥	৪২
ওয়ার্ক কালচার ॥ ২ ॥	৪৪
ওয়ার্ক কালচার ॥ ৩ ॥	৪৬
ওয়ার্ক কালচার ॥ ৪ ॥	৪৮
জামাই ঠকানো প্রশ্ন বা হেঁয়ালি	৫০
কঠিন কঠোর গদ্য	৫২
ভূতের পাঁচালি	৫৪
সবিনয় নিবেদন	৫৬
হোটেল	৫৮
শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কাব্য ॥ ১ ॥	৬০
শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কাব্য ॥ ২ ॥	৬২
দে গরুর গা ধুইয়ে ॥ ১ ॥	৬৪
দে গরুর গা ধুইয়ে ॥ ২ ॥	৬৬
লক্ষ্মণের কার্টুন ॥ ১ ॥	৬৮
লক্ষ্মণের কার্টুন ॥ ২ ॥	৭০
রাজনীতি	৭২
আবার রাজনীতি	৭৪
ভারতীয় কার্টুন	৭৬
পুনশ্চ কার্টুন	৭৮
রবীন্দ্রনাথ ও খুশবন্ত সিংহ	৮০
একটি পুরাতন গল্প	৮২
রেল স্টেশন	৮৪
সজনীকান্ত দাস	৮৭
বুদ্ধু ও বুদ্ধিমান	৮৯
সরল ও বোকা	৯১
পরিত্যক্ত পরিহাস	৯৩
কুমারেশ ঘোষ	৯৫
আগরতলা বইমেলা এবং একজন মোটা মানুষ	৯৭
সরস কবিতা	১০০
হাস্যরূপেন সংস্থিতা	১০৩
মহাজ্ঞানী-মহাজন	১০৫
আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে	১০৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১১০
গাধাঘোড়া	১১২
অবাক কাণ্ড	১১৪
যাহা পাই, তাহা চাই না	১১৬
ফুল	১২১
ফাজিল কথামালা	১২৪

ঢাকাই রসিকতা

কলকাতা থেকে যেমন কলকাতিয়া কিংবা কলকাত্তাই, ঢাকা থেকে তেমনই ঢাকাই। ঢাকাই মানে ঢাকার, অভিধান বলছে ঢাকা সম্পর্কিত। কিন্তু মানেটা আরো একটু বেশি। ঢাকাই বিশেষণপদটি সম্ভ্রমবহ।

দুয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আগে কলকাতা দিয়ে শুরু করি। কলকাতিয়া কথা, কলকাত্তাই বোলচাল। বিশেষণ দুটোয় কোথায় যেন একটা হেয়ভাব লুকোনো আছে।

'ঢাকাই' শব্দটিতে কিন্তু একটা উৎকর্ষের আভাস আছে। পরতে পরতে মুচমুচে ঢাকাই পরোটা। ঢাকাই শাড়ির কদরও কিছু কম নয়। তাছাড়া আছে লেজফোলা ঢাকাই বিড়াল, পূর্ববঙ্গে সে বিড়াল কাবুলি বা শ্যামদেশীয় বিড়ালের মতই বিখ্যাত। বোধহয় কাবুলি বিড়ালেরই বংশোদ্ভব এই বিড়ালকুল কোন এক সময়ে নবাবী আমলে ঢাকা বাসিন্দা হয়েছিল।

সে যা হোক, আমাদের বিষয় হল ঢাকাই রসিকতা। ভূমিকা হিসেবে বলতে পারি, অন্যান্য ঢাকাই দ্রব্যের মতই ঢাকাই রসিকতাও অতি উচ্চমানের।

হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার বলে একটা কথা আছে না? সরাসরি উদাহরণে চলে যাই। তবে একটা কথা বলে রাখি, সাধারণত এসব রসিকতা ঢাকার স্থানীয় ভাষায় বলা হয়। তবে সে ভাষা খুবই জটিল এবং খোদ ঢাকা শহরেই সে রকম ভাষায় কথা বলা লোক এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এইসব রসিকতার উৎস যে কুট্টি সমাজ তারাও সকলের অগোচরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নবাবী জমানায় কুট্টিরা ঐ ঢাকাই বিড়ালের মতই ঢাকায় বাস করতে শুরু করে। তাদের বিষয়ে অনেক রকম উল্টোপাল্টা ইতিহাস আছে। শেষপর্যন্ত এদের পেশা হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি চালান। ফলের বাজারে ব্যাপারি বা ফেরিওয়ালার কাজও করত। স্বভাবত সুরসিক প্রখর বুদ্ধিমান এই কুট্টিসমাজ পূর্ববঙ্গীয় গালগল্পে অমর হয়ে আছে।

এবার সহজবোধ্য করার জন্যে আমি আমার ভাষায় কুট্টিদের গল্প বলি।

বাজারে এক ভদ্রলোক আম কিনতে গেছেন। আমওয়ালা একজন কুট্টি। যে কোন ফলওয়ালার মতই সে পছন্দ করে না যে খদ্দের ফল নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাটি করুক বা টিপেটিপে পরীক্ষা করে দেখুক।

এই খদ্দের ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি কুট্টির বাধা সত্ত্বেও ফল টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। তখন সেই কুট্টি চেঁচিয়ে অন্য আমওয়ালাদের বলতে লাগল, 'ওরে তোরা আয়। তোদের আমের কোন রোগ-বালাই থাকলে এখানে নিয়ে আয়। বাজারে আমের ডাক্তার এসেছে। তাকে দিয়ে টিপিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে যা।'

এরচেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক হল কুট্টি মাছওয়ালা।

মাছওয়ালা যে মাছগুলি নিয়ে বাজারে এসেছে সেগুলো বিশেষ তাজা নয়।

এক ভদ্রলোক মাছগুলো উল্টেপাল্টে দেখে অবশেষে কুট্টিকে বললেন, 'মাছগুলো টাটকা নয় বলে মনে হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কুট্টির প্রতিবাদ, 'বলেন কি কর্তা? এই মাছ এখনই খালের জলে ছেড়ে দিলে সাঁতরিয়ে চলে যাবে।'

কিন্তু এ কথা খদ্দের বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন, 'মরা মাছ জলে সাঁতরাবে?'

কুট্টি বলল, 'কর্তা, আপনি ঐ খালপারের টিনের বাড়িটায় থাকেন না?' কর্তা বললেন, 'তাতে কি হল?'

কুট্টি বলল, 'আপনি দাম দিয়ে এই মাছটার গায়ে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। আমি জলে ছেড়ে দেব। দেখবেন ঠিকানা দেখে সাঁতরিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবে।'

সৈয়দ মুজতবা আলি, আমার দেবাদিদেব, মহাগুরু। ঢাকার লোক ছিলেন না। এ কথাটা বলছি এই কারণে যে পূর্ববঙ্গ বা অধুনাতন বাংলাদেশ কিংবা সেই কায়েদে-আজমি পূর্ব-পাকিস্তান বলতে চিরকাল সবাই ভাবেন ঢাকা। ঢাকার নয় শ্রীহট্টের লোক হয়েও কিন্তু সৈয়দ সাহেব একটি স্মরণীয় ঢাকাই রসিকতার উল্লেখ করেছিলেন। রসিকতাটি রাজনৈতিক এবং মর্মান্তিক।

তখন সদ্য পাকিস্তান হয়েছে। দলে দলে হিন্দু ভদ্রলোকেরা ঢাকা ছাড়ছেন, ভারতে চলে আসার জন্যে। অনেক সহৃদয় মুসলমান ছিলেন, যাঁদের হিন্দুদের এই চলে যাওয়াটা ভাল লাগেনি।

স্টিমারঘাটে এক হিন্দু পরিবার কুট্টির ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এসেছে, মালপত্র নামাচ্ছে। এমন সময় পরিচিত এক মুসলমান ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। হিন্দু পরিবারের কর্তাকে বোঝাতে লাগলেন দেশত্যাগ না করার জন্যে। অনেক অনুরোধ করার পরে বললেন, 'দেখুন, এ দেশ শুধু মুসলমানদের নয়। পাকিস্তানের পতাকা দেখুন। তিনভাগ সবুজ, একভাগ সাদা। সবুজ হল মুসলমান, সাদা হল হিন্দু। আপনি দেশ ছাড়বেন কোন্ দুঃখে। আপনার জায়গাও তো এখানে রয়েছে।'

এমন সময় কুট্টি সেই হিন্দু পরিবারের কর্তাকে একটু আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল, 'কর্তা, বাঁচতে চান তো পালান। দেখছেন না, ফ্ল্যাগের ঐ সাদা জায়গাটিতেই বাঁশটা দিয়েছে।'

পাঠক, একবার পাকিস্তানের পতাকা স্মরণ করুন। চাঁদতারা শোভিত তিনভাগ সবুজ, পাশে একভাগ সাদা—যার মধ্য দিয়ে বংশদণ্ড ঢুকিয়ে পতাকা ওড়ানো হয়। অতঃপর সেই কুট্টির ভবিষ্যৎ জ্ঞানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করুন।

ঢাকাই কুট্টির গল্পগুলির অধিকাংশই কোচম্যান কুট্টিকে নিয়ে। সব উল্লেখ করতে গেলে কাগজ কাবার হয়ে যাবে। আর সবই কি আমি জানি?

যা জানি তার থেকে দুটো গল্পের উল্লেখ করছি।

সে সময় ঢাকা শহরের তদানীন্তন মেয়র সাহেবের উদ্যোগে পশুক্লেশ নিবারণী আইনের খুব কড়াকড়ি। খাকি পোশাক, হাতে ছড়ি নিয়ে ইনস্পেক্টররা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। রাস্তায় কোন গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি দেখলেই ইনস্পেক্টর সেটাকে দাঁড় করান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভারবাহী জন্তুটাকে দেখেন; সেটা রুগ্ণ কিনা, দুর্বল কিনা। সেটার কোন অসুখ আছে কিনা। কোন গাফিলতি ধরা পড়লেই ফাইন, দু'টাকা, পাঁচ টাকা।

এক কুট্টি কোচম্যানের ঘোড়ার গাড়ি আটকিয়েছেন ইনস্পেক্টর। দেখা গেল ঘোড়াটার পিঠের দুদিকে যেখানে ঘোড়া জুতবার কাঠের দণ্ড দুটো থাকে সেখানে ঘা হয়েছে। এরকম ঘা কাঠে অনবরত পিঠ ঘষে যাওয়ায় সব ছ্যাঁকরা গাড়ির ঘোড়ার পিঠেই প্রায় থাকে।

এক্ষেত্রে কুট্টি ধরা পড়ে গেছে। তার ফাইন হয় আর কি? কিন্তু কুট্টিকে কায়দা করা অত সহজ নয়। সে বলল, 'ও পিঠের দুদিকে ও দুটো মোটেই ঘা নয়। আমার এটা পক্ষীরাজ ঘোড়া। ডানাদুটো ছেঁটে দিয়েছি, তাই ডানার জায়গাটায় ঘায়ের মত ঐ দাগ দুটো হয়েছে।'

এরপরে কি হয়েছিল, এতকাল পরে আমরা আর বলতে পারব না। বরং এবার শেষ গল্পটা বলি।

এটি অবশ্য বহুপ্রচলিত, বহু বিখ্যাত গল্প। খদ্দের কুট্টিকে বলেছে, 'রমনা যেতে কত লাগবে'। কুট্টি অবিশ্বাস্য বেশি দর হেঁকে বলল, 'পাঁচ টাকা'।

খদ্দের ভদ্রলোক পুরনো যাত্রী, তিনি আসল ভাড়া ভালই জানেন, তিনি বললেন, 'আট আনা'। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেকালের পুরনো ঢাকায় এরকম দামদর মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। লোকের হাতে ছিল অঢেল সময়, দামদর করা একটা আর্টের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এখনও কলকাতার হকার্স কর্নারগুলিতে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। চিরকালই বেশ কিছু লোক দামদর না করে কেনাকাটা করা পছন্দ করে না।

সে যা হোক, কুট্টির গল্পটা শেষ করি। পাঁচ টাকার বদলে যখন যাত্রী আট আনা বলল, কুট্টি হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'আস্তে বলেন স্যার, আমার ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'।

কুট্টির এই উক্তিটি ঢাকায় আজও কিম্বদন্তী হয়ে আছে।

গোলমেলে

এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত রকম গোলমেলে ঘটনা ঘটছে। কত মানুষ কত রকম গোলমেলে উক্তি করছে। সে সব শুনলে আমরা মজা পাই। সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীকে নিয়ে হাসাহাসি করি। অনেক সময় নিজেরা টের পাই না যে আমাদের অনুরূপ কথাবার্তা কাজকর্মের জন্যে অন্যেরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে।

সেই যে ডাক্তারবাবুকে রোগী জানিয়েছিলেন যে, 'ডাক্তারবাবু, এমনিতে কোন কষ্ট আর নেই। শুধু নিঃশ্বাসের বড় কষ্ট পাচ্ছি।' এর জবাবে নাকি ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ও আমি শিগ্‌গিরই বন্ধ করে দেব।'

এই গোলমেলে প্রবোধবাক্যে রোগী কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, বলা কঠিন। শিগ্‌গিরই নিঃশ্বাসের কষ্ট বন্ধ হয়ে যাবে—এ প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই তিনি ভাবিত হয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু জড়িত এর একটা বিপরীত প্রান্তের গল্প বলি।

এক রোগী তাঁর রক্তে অধিক কোলেস্টরল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল চিকিৎসার পরে রোগীর রক্তে কোলেস্টরল কমে যায়। রোগী অতঃপর ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাভ নেই। এ ব্যাপারে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যকে ধন্যবাদ দিন। এই অগ্নিমূল্যের জন্যই আপনি ঘি-মাখন-ডিম-মাংস কিনে খেতে পারছেন না। তাই স্বাভাবিকভাবেই আপনার কোলেস্টরল কমে গেছে।'

অগ্নিমূল্যের সূত্রে একটি গোলমেলে বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছে।

এক দোকানের বাইরের সাইনবোর্ডে নিচের বিজ্ঞাপনটি দেয়া ছিল।

'তুলনামূলকভাবে কম দামে জিনিস কিনুন।'

সাধারণত এ ধরনের বিজ্ঞাপন নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না, কার অত সময় আছে। কিন্তু জনৈক চিন্তাশীল খদ্দের জানতে চেয়েছিলেন, 'কিসের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম দাম?'

প্রবীণ দোকানদার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'আগামী সপ্তাহের দামের সঙ্গে।'

ঠিক এ রকম কথা আমাদের এক বন্ধু বলতেন। সব সময়েই বলত, 'ভাল আছি'।

একদিন আমি তাকে আলাদা করে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কি করেএত ভাল থাক?'

সেও বলেছিল, 'তুলনামূলকভাবে।'

আমি বাধ্য হয়ে বলেছিলাম, 'মানে?'

বন্ধুবর বলল, 'গতকালের তুলনায় অবশ্যই খারাপ আছি। কিন্তু ভাল আছি আগামীকালের তুলনায়।'

দিনদিন সময় খারাপ হচ্ছে। আগামীকালের তুলনায় আমরা সবাই ভাল আছি। কথাটা গোলমেলে হলেও সত্যি।

গোলমেলে কাহিনীর শেষটায় আবার ডাক্তারে ফিরে আসি।

একটি ছোট ছেলে একটি সিকি গিলে ফেলেছিল। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরের দিন হাসপাতালের সুপার যখন সকালে প্রাত্যহিক রোদে বেরিয়েছেন, শিশু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হাউস সার্জনকে প্রশ্ন করলেন, 'সেই বাচ্চাটির কি খবর? যে সিকি গিলেছিল?'

সুরসিক, তরুণ হাউস সার্জন বললেন, 'স্যার, কোন চেঞ্জ দেখছি না।' এখানে চেঞ্জ মানে সিকি, সিকিটা এখনও পেট থেকে বেরয়নি, তাই দেখা যাচ্ছে না।

এবার চক্ষু চিকিৎসকের প্রসঙ্গে আসি।

এক ভদ্রলোক চোখ দেখাতে এসেছিলেন। চোখের ডাক্তার একটু দূর থেকে হাতের পাতা মেলে দিয়ে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে ধরে রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার হাতে কয়টা আঙুল দেখছেন?'

রোগী বহুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, অনেক চিন্তা করে প্রথমে বললেন, 'সাত।' তারপর নিজেকে সংশোধন করলেন, 'না। না। ছয়।'

চোখের ডাক্তার অবাক হয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আপনার চোখই বেশি খারাপ নাকি আপনি অঙ্কেই বেশি খারাপ, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

এর পর শেষ গল্প। এটি একাধিক কারণে গোলমেলে, এখানেও ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু রোগীকে ওজন কমানোর জন্যে রসুন খেতে বলেছিলেন। প্রচুর রসুন। দু'বেলায় ভাতের সঙ্গে রসুন, সকাল-বিকেল জলখাবারের সঙ্গে রসুন।

একদিন এক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রসুন খেয়ে তোমার ওজন কি কিছু কমল?'

রোগী বিরস কণ্ঠে জানালেন, 'না ওজন কমেনি। তবে বন্ধুবান্ধব একেবারে কমে গেছে। রসুনের গন্ধে কেউ কাছে ঘেঁষছে না।'

বিড়ম্বনা

মানুষের জীবনে বিড়ম্বনা আসে নানা ভাবে। প্রথমে কাজি সাহেবের গল্পটাই ধরা যাক।

কাজিসাহেবের খাসির ব্যবসা আছে। তাঁর খাসিকুলের বাজারে খুব সুখ্যাতি। সেগুলো যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনই মাংসল। অন্য খাসির মাংসের চেয়ে তাঁর খাসি মাংসের বাজার দর স্বভাবতই বেশি।

একদিন কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক এলেন কাজি সাহেবের দোকানে। তিনি একথা-সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার খাসির মাংসের দাম বেশি কেন?'

একটি নধরকান্তি খাসির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আদর করে সেটার গলা চুলকোতে চুলকোতে কাজিসাহেব বললেন, 'বাজারে এত ভাল মাংস পাবেন না। আমি এগুলোকে যে সব জিনিস খাওয়াই, বড়লোক মানুষেরাও সে সব খেতে পায় না।'

প্রশ্নকারী জানতে চাইলেন, 'কি সব জিনিস?'

কাজিসাহেব গর্বিতভাবে বললেন, 'সাদা ছোলা, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম এমন কি খোয়া-ক্ষীর পর্যন্ত খাওয়াই।'

এইবার প্রশ্নকর্তা স্বমূর্তি ধারণ করলেন, জানা গেল তিনি আয়কর দপ্তরের লোক। তিনি খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন, খাতাপত্র দেখতে চাইলেন, এত দামি দামি খাবার কেনার পয়সা আসে কি ভাবে, খাসির মাংস বেচে কত কত লাভ হয়।

বলা বাহুল্য, সেবার খুব নাজেহাল হয়েছিলেন কাজিসাহেব। বেশি অহঙ্কার করতে গিয়ে বিস্তর গুনাগার দিতে হয়েছিল তাঁকে।

এর পরে সাবধান হয়ে গেলেন কাজিসাহেব।

আবার অনেকদিন পরে একজন লোক এল। তিনিও কিঞ্চিৎ কথাবার্তার পরে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা কাজিসাহেব, আপনার এই চমৎকার খাসিগুলোকে আপনি কি খেতে দেন।'

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কাজিসাহেব প্রকৃত তথ্য গোপন করে বললেন, 'কিছুই খেতে দিই না, শুকনো ঘাসপাতা খেয়ে থাকে।'

আগন্তুক স্বভাবতই বললেন, 'তা হলে এগুলো এতটা মোটাসোটা হয় কি করে?'

কাজিসাহেব বললেন, 'সে আর বলবেন না। এগুলোকে দু'বেলা আচ্ছাসে চাবকাই। চাবুক মেরে মেরে এগুলোর শরীর ফুলো ফুলো করে দিই।'

দুঃখের বিষয়, এবারও ঘোরতর বিপদে পড়লেন আমাদের কাজিসাহেব। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন পশুক্লেশ নিবারণী পর্ষদের পরিদর্শক। অল্পের জন্য জেল খাটার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। তবুও নিরীহ, অবোলা জন্তুকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে ভাল মতন জরিমানা দিতে হল কাজিসাহেবকে।

ঠিক এর পরে পরেই এবার এক তৃতীয় ব্যক্তি এলেন এবং কি আশ্চর্য, এই ভদ্রলোকও কাজিসাহেবের খাসিদের খাদ্যতালিকা সম্পর্কে কৌতূহলী।

কিন্তু পর পর দু'বার মোক্ষম ধাক্কা খেয়ে কাজিসাহেব এখন অনেক সেয়ানা হয়ে গেছেন।

তৃতীয় ভদ্রলোক যেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের আপনি কি খেতে দেন? কি খেয়ে আপনার খাসিগুলো এমন সুন্দর হয়েছে?'

কাজিসাহেব অম্লানবদনে জবাব দিলেন, 'আমি নিজে থেকে ওদের কিছু খেতে দিই না। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে প্রত্যেককে পাঁচটা করে টাকা দিই। বলে দিই, তোমাদের যা ভাল মনে হয়, বাজার থেকে কিনে খেয়ো।'

কাজিসাহেবের গল্পটা বড় হয়ে গেল, জলাঞ্জলির পক্ষে খুবই বড়। এ যাত্রা আর একটি মাত্র ছোট গল্পের সুযোগ আছে।

তবে ছোট হলেও বিড়ম্বনার গল্প হিসেবে গল্পটি মারাত্মক।

এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়ি চালানোর জন্য নতুন ড্রাইভার নিযুক্ত করেছেন। প্রথম দিনই ড্রাইভারটির কাজ পড়ল মেমসাহেবকে মার্কেটিংয়ে নিয়ে যাওয়া।

মার্কেটিং সেরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে মেমসাহেব তাঁর স্বামীর বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। স্বামী বাড়িতে আসামাত্র তাঁর কাছে নালিশ জানালেন, 'তোমার এই নতুন ড্রাইভারের সঙ্গে বেরনো এক মহা বিড়ম্বনা। ওকে দিয়ে চলবে না।'

অফিসের জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে স্বামী বেচারা জানতে চাইলেন, 'কেন কি হয়েছে?'

মেমসাহেব বললেন, 'এই লোকটা সাঙ্ঘাতিক খারাপ গাড়ি চালায়। তিনবার আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল।'

পতিদেবতা নিরাসক্তভাবে বললেন, 'ওকে অন্তত আর একটা চান্স দাও।'

সময় ও বয়েস

দুই বাল্যবান্ধবীর মধ্যে দেখা প্রায় কুড়ি বছর বাদে। দু'জনেই শৈলশহর ভ্রমণে এসেছেন। পাহাড়ঘেঁষা একটা হেলান দেয়া কাঠের বেঞ্চিতে বসে দু'জনেই বকবক করে যাচ্ছেন। নিজেদের স্বামী-সংসার, বয়েস বেড়ে-যাওয়া এসব নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে।

কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, প্রথমা বান্ধবীর এখন বয়েস হয়েছে তিরিশ। তিনি বললেন, 'সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলিয়ে যায়, এই আমারই তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেল।'

এই শুনে দ্বিতীয়া বান্ধবী বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস, সময়ের সঙ্গে সব বদলায়। কুড়ি বছর আগে আমাদের দু'জনারই বয়েস ছিল ষোল। এখন তোর তিরিশ আর আমার ছত্রিশ।'

বলা বাহুল্য, সময়ের সঙ্গে সমস্ত কিছু বদলানোর উদাহরণ হিসেবে ওপরের গল্পটি মোটেই ভাল নয়।

সেই কবে বাল্যকালে আমরা জেনেছিলাম—

নদীর স্রোতের প্রায়
সময় বহিয়া যায়।

এই স্রোতের গতি কিন্তু নদীর মতই একেক সময় একেক রকম। কখনও সে খরস্রোতা, ঝড়ের মত বয়ে যায়। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে মানুষ দেখে অবলীলাক্রমে পাঁচ-দশ-বিশ বছর চলে গেছে।

আবার কখনও সময় থমকিয়ে যায়। দিন আর কাটতে চায় না, গুরুভার পাষাণের মত বুকের ওপর চেপে বসে।

সে যা হোক, এ রকম ছেঁদো দার্শনিকতা করে লাভ নেই। বরং দুয়েকটা সোজা কথা বলি।

আপনারা জানেন কি, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কেন অধিক সংখ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হন। এর অনেক কারণ থাকতে পারে—চিকিৎসাশাস্ত্র, শরীরবিজ্ঞান অনেক কথাই বলে।

কিন্তু চূড়ান্ত কথাটি বলেছিলেন এক ফরাসি হাস্যরসিক। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'মেয়েদের যৌবনকাল অতি দীর্ঘ, কোনও রমণীই সহজে বুড়ি হতে চান না। তিরিশ থেকে চল্লিশ হতে তাঁর পনেরো বছর লাগে, এর পরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হতে কুড়ি বছর। ফলে একজন পুরুষ মানুষের থেকে পনেরো বছর এগিয়ে থাকেন—পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে তাঁরা পঞ্চাশ পূর্ণ করেন।'

ওই হাস্যরসিক ভদ্রলোকই বলেছিলেন, 'ভদ্রমহিলারা যতই অসঙ্গত কথা বলুন, শুধু একটি বিষয়ে তাঁদের কথার নচড়চড় হয় না, সেটা ঠিক থাকে। এই বিষয়টি হল বয়েস, মহিলাদের বয়েস নাকি সময়ের সঙ্গে বাড়ে না। বরং কখনও কখনও কমে যায়।'

যাঁদের বয়েস বাড়ে, তাঁদের কথাও বলতে হয়। এক খ্যাতনামা বৃদ্ধকে তাঁর নব্বুই বছরের জন্মদিনে জনৈক রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি বলতে পারেন, আপনাকে কেন ঈশ্বর এত দীর্ঘজীবী করেছেন?'

বৃদ্ধ প্রশ্নটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর অম্লানবদনে বললন, 'আমার আত্মীয়স্বজনের ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে বোধহয়।'

এ অবশ্যই কথার কথা।

মানুষ দীর্ঘজীবী হয় কি কি কারণে তা হয়তো কোনওকালেই জানা যাবে না। যিনি নিয়মিত নিরামিষ খান, যিনি নিয়মিত আমিষ খান, যিনি দৈনিক চার প্যাকেট সিগারেট খান, যিনি কখনও ধূমপান করেন না, যিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান, ঠিকমত ওষুধবিষুধ খান, যিনি কখনওই ডাক্তার দেখান না—এঁদের কারুরই দীর্ঘজীবী হতে বাধা নেই, হয়েও থাকেন। আমাদের প্রত্যেকেরই চোখের সামনে এ রকম অসংখ্য উদাহরণ সশরীরে উপস্থিত আছেন।

তবু সময় যাবে। বয়েস বাড়বে। শীতের দিনে একটু বেশি শীত করবে। চোখের কাঁচ আরও পুরু হবে। সময়ের সঙ্গে বয়েস বাড়াকে আমাদের মেনে নিতে হবে।

সে জন্যে মন খারাপ করে বসে থেকে বা চুলে কলপ দিয়ে বোকা সেজে কোন লাভ নেই।

নাটক

নাটকের মৌতাতে মশগুল হয়ে যাচ্ছি।

চোখের সামনে যা কিছু দেখছি, যে সব ঘটনা ঘটছে সবই মনে হচ্ছে নাটকীয়। যে যা কিছু বলছে মনে হচ্ছে থিয়েটারের পার্ট বলছে। ডায়ালগ দিচ্ছে। মহাকবি শেক্সপিয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, 'এই জগৎটা একটা রঙ্গমঞ্চ, এখানে আমরা নির্দিষ্ট ভূমিকায় বাঁধাধরা অভিনয় করে যাচ্ছি।'

পাঠক-পাঠিকা, ঘাবড়িয়ে যাবেন না, আমি একটা নাটক লিখছি। স্পষ্ট করে বলা যায়, আমি একটা নাটক রচনার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেছি।

যাঁরা এইটুকু জেনে 'হায়-হায়' করছেন তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্যেই গল্প, নাটকটা আমি ঠিক লিখছি যে তা নয়, কায়দামত টুকছি। নাটক লেখার যোগ্যতা আমার নেই। বিখ্যাত বিদেশি নাট্যকারের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

হয়তো তার আগে কথাটা আরও কেউ বলে থাকতে পারেন, আমরা যৌবন বয়েসে সেকালের বিখ্যাত সরস পত্রিকা দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্পাদিত 'অচলপত্র' পত্রিকায় পড়েছিলাম নাটক হল—না টক, না মিষ্টি। এমন কিছু আহামরি রসিকতা নয়, কিন্তু কথাটা আজো মনে আছে।

এখন নাটক অনুবাদ করতে গিয়ে তেমনিই মনে পড়ছে, নাটক-সংক্রান্ত কয়েকটি পুরনো গল্প। আগে এ সব নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছি, কিন্তু এবার নিজেই নাটকের খাতায় নাম লিখিয়েছি, এর পরে আর ইয়ার্কি চলবে না। তাই শেষবারের মত একবার হেসে নিই।

প্রথমে সেই বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের কাহিনীটা বলি। সেই নাটকের গল্পটি অতিশয় সরল ও গতানুগতিক। প্রায় দেবদাস টাইপ বলা যায়। নায়ক মদ্যপ, ব্যর্থ প্রেমিক। অনেক টানাপোড়েনের অবসানে শেষ দৃশ্যে রয়েছে নায়কের বিষপানে আত্মহত্যা।

পুরো নাটকে অন্তত পাঁচ-সাতটি মদ্যপানের দৃশ্য রয়েছে। সেই সঙ্গে যথারীতি রয়েছে মহাজনের অত্যাচার। জোতদারের কুটিলতা, বন্ধুর কৃতঘ্নতা, সতীসাধ্বী স্ত্রীর নানা পথে গমন, সর্বোপরি যৌনকর্মীদের সততা ও সতীত্ব ইত্যাদি সম্বলিত মহৎ দৃশ্যাবলী।

বলা বাহুল্য, নায়কের ভূমিকায় অভিনয়কারী চরিত্রটি সুদীর্ঘ ও হৃদয়বিদারক পালাটিতে অভিনয় করতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠতেন। অবশেষে নায়ক ভদ্রলোক একদিন অভিনয়ের

সময়ে দৃশ্যের ফাঁকে থিয়েটারের ম্যানেজারসাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন, 'স্যার, এই সব ড্রিঙ্কিংয়ের সিনে আপনি যদি আমাকে লাল সরবত না দিয়ে সত্যি মদ দিতেন তা হলে কিন্তু আমার পার্টটা অনেক বেশি উতরোত।'

বহু ঘাটের জল এবং বহু রকম বোতলের মদ খাওয়া ঘুঘু ম্যানেজারসাহেব এই অনুরোধ শুনে নাকি সেই নায়ককে বলেছিলেন, 'দ্যাখো বিষ্টুলাল, তুমি যদি মদ খাওয়ার সিনে সত্যিই মদ খেতে চাও, আমার আপত্তি নেই, আমি দেব। কিন্তু মনে রেখো তা হলে কিন্তু শেষ সিনে ওই আত্মহত্যার দৃশ্যে তোমাকে সত্যিকারের বিষ গিলতে হবে।'

আমাদের অনুমান, নায়ক নিশ্চয়ই এর পরে আর কোনদিন ম্যানেজারসাহেবের কাছে মদ খেতে চাননি। তবে থিয়েটারের পৃথিবীর কথা হলফ করে কিছু বলা যায় না।

এই ম্যানেজারসাহেবকে নিয়েই আরও একটি গল্প আছে।

সেটাও আর এক দুঃখের নাটক। তেমন চৌকশ নন এমন এক অভিনেত্রী সেই নাটকের নায়িকা। ভয়াবহ করুণ কাহিনী, দৃশ্যে দৃশ্যে মহিলা নির্যাতিতা হচ্ছেন। পুরো নাটকে নায়িকা তিনবার ধর্ষিতা হলেন। নির্যাতনকারীরা যেমন হয়, কখনও পুলিশ, কখনও গুণ্ডা, কখনও বাড়িওলা, কখনও জমিদার, কখনও সন্ন্যাসীবেশে স্বয়ং শয়তান।

এত নির্যাতন একজনের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তাই বইয়ের শেষ দিকে নায়িকার অভিনয় কেমন ছাড়া-ছাড়া, কাঠ-কাঠ হয়ে যেত। নাটক তেমন জমত না।

একদিন কিন্তু অবাক কাণ্ড। নায়িকা মারমার কাটকাট অভিনয় করলেন। অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণের দৃশ্যে হলশুদ্ধ দর্শক কেঁদে আকুল।

শেষ দৃশ্যের পরে ম্যানেজারসাহেব নায়িকাকে অভিনন্দন জানালেন। তখন নায়িকা সরল মনে বললেন যে, 'আসলে জানেন স্যার, আমার চপ্পলে একটা পেরেক উঠে গেছে। এমন যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাই বাধ্য হয়ে অত কাঁদাকাটি করছিলাম, ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।'

ম্যানেজারসাহেব আর কথা শেষ করতে দিলেন না, প্রস্তাব করলেন, 'এখন থেকে মাসে আপনার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেব, প্রত্যেক শোতে আপনি ওই কাঁটা-ওঠা চটিটা পরে পার্ট করবেন।'

পত্রসাহিত্য

কোন ব্যক্তির জনপ্রিয়তা, ঐহিকক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যে পরিমাণ চিঠি পান তার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে।

লোকে প্রয়োজনে চিঠি লেখে, তবে বিনা প্রয়োজনেও চিঠি লেখে। এই সব প্রায় অপ্রয়োজনীয় চিঠি যেমন বিজয়ার শুভেচ্ছা, নববর্ষের গ্রিটিংস কিংবা 'বহুদিন রামগোপালের খবর পাই না' ডাক বিভাগের কাছে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, প্রয়োজনীয় চিঠির থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি।

আজকাল অবশ্য দূরদর্শন কুইজের উত্তর পাঠানো পোস্টকার্ডই ডাকবাক্সের অর্ধেক ভরিয়ে দেয়। তা ছাড়া বিভিন্ন নামী-দামী পণ্যদ্রব্যের স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতাও কম জনপ্রিয় নয়। সে রকম চিঠির সংখ্যাও প্রচুর।

বলা বাহুল্য, চিঠির সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা বরং পত্রসাহিত্য সরাসরি সুকুমার রায়ের ক্যাচলের পত্র দিয়ে শুরু করি :—শ্রীমান বাঞ্চারাম উপ্রতিশীলেষু,

তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে, আমি তোমায় চিঠি লিখিনি।

কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না। তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কি না, সেটা একটু ভাবা দরকার।

কিছু না করাটা যদি একটা কাজ হয়...

পাঠকেরা অবশ্যই জানেন এটি একটি দীর্ঘ চিঠি, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা সঙ্গত হবে না। বরং পত্রপ্রেরকদের সম্পর্কে কিছু ভাবা যেতে পারে। পত্রপ্রেরকেরা যে-কোন জায়গায় থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর 'রসিকতার ফলাফল' রম্যনিবন্ধে অষ্টপাইকা, সাপটিবাড়ি এবং টাঙ্গাইল থেকে এবং তারপরে হবিগঞ্জ থেকে পত্রাঘাত পাওয়ার কথা কবুল করেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি চিঠির মতিগতি বোঝা যায় না। চিঠি কোথা থেকে আসবে, কবে, কার কাছ থেকে, কেন আসবে—তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

আপনার কাছে আজ বিকালের ডাকেই বলরামপুর থেকে চিঠি আসতে পারে যে, চিঠি পাওয়া মাত্র সঙ্গে প্রেরিত ষোলটি ঠিকানায় ডাকযোগে পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিন, দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন, এক মাসের মধ্যে চেন সিস্টেমে আপনার কাছে তিন হাজার টাকা ডাকযোগে চলে আসবে। বলে রাখা উচিত চেন সিস্টেমটা যে কি বোঝার চেষ্টা করবেন না।

এর চেয়েও অবশ্য বিপজ্জনক হতে পারে ঠিকানাবিহীন কোন চিঠি, যাতে ভয় দেখানো আছে চিঠি পাওয়া মাত্র যদি অন্তত পঁচিশজনকে শ্রী শ্রী ১০৮ বাবার মাহাত্ম্য জানিয়ে পোস্টকার্ড না পাঠান তা হলে আপনার সমূহ সর্বনাশ হবে, চাকরি যাবে, হাজতবাস হবে, ওলাওঠায় মৃত্যু হবে।

তবে ভালর দিকও আছে। পঁচিশটি চিঠি নির্দেশমত তাড়াতাড়ি ডাকবাক্সে ফেললেই প্রাপ্তিযোগ, সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রমোশন হতে পারে, লটারিতে টাকা পেতে পারেন, আপনার শত্রু বিনা মেঘে বজ্রপাতে ঘায়েল হতে পারে।

একে ঠিক উড়ো চিঠি বলে না। এই সব সার্কুলার জাতীয় চিঠিগুলো কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের জন্যে নয়।

উড়ো চিঠির ব্যাপার আলাদা। সে চিঠি ভয় দেখান, কান ভাঙান। এককালে উড়ো চিঠির খুব রমরমা ছিল। লোকে কথায় কথায় উড়ো চিঠি দিত, এর একটা বেশি অংশ যেত বিবাহযোগ্যা মেয়ের চরিত্র নিয়ে ভাবী শ্বশুরবাড়িতে। জনৈক শুভানুধ্যায়ী স্বাক্ষরিত এই সব চিঠির যুগ প্রায় শেষ হয়েছে। তার জায়গা নিয়েছে উড়ো টেলিফোন।

উড়ো চিঠি নিয়ে বাংলা ভাষায় একটা মর্মান্তিক গল্প আছে, লিখেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি। গল্পটার নাম বোধহয় 'পত্রলেখার বাবা'। পাঠক-পাঠিকা খুঁজে বার করে গল্পটা আর একবার পড়ে নেবেন।

উড়ো চিঠির দিন যেমন শেষ হয়েছে তেমনিই শেষ হয়েছে সেই সব চিঠির দিন, যার নিচে পুনশ্চ জুড়ে লেখা থাকত :—

'এই পত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া চলিয়া আসিবা।'

বাংলা চিঠির এই বয়ান আমাদের যে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পূর্বসূরী উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁকে এতদিন পরে অভিনন্দন জানাতে হয়। তিনি কি করে অতকাল আগে টের পেয়েছিলেন একদিন টেলিগ্রাম আর চিঠির গতি এক হবে। টেলিগ্রাম চিঠির মতই আসবে, একদিনের পথ সাতদিনে।

কৌকার কৌতূহল

এবারকার লেখা কিন্তু বড়দের জন্যে নয়। ছোটদের জন্যে স্পেশাল জলাঞ্জলি। বয়স্কদের না পড়লেও চলবে।

কৌস্তুভকান্ত আর কৌকা যে একই ব্যক্তি, অর্থাৎ যার নাম কৌস্তুভকান্ত তারই ডাকনাম কৌকা—এ রকম বিসদৃশ ব্যাপার ভাবা যায়!

তদুপরি এ কথাও জানানো প্রয়োজন যে, এই বিশাল নামের বোঝা যার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার বয়েস মাত্র সাড়ে আট। আর এই দুষ্কর্মটি করেছেন কৌস্তুভকান্তের পিতামহ রামচাঁদবাবু।

রামচাঁদবাবুর নিজের নামটি ছোট, পারিবারিক পদবীও আরও ছোট 'দে'। রামচাঁদ দে, যিনি পরিচিতদের মধ্যে রামু দে নামেই পরিচিত, তিনি ছিলেন শ্যামচাঁদ দে-র ছেলে এবং পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে তাঁর ছেলে, কৌস্তুভকান্তের বাবার নাম রেখেছিলেন ধ্যানচাঁদ দে।

সে অনেককাল আগের কথা, ধ্যানচাঁদ হকির জগতের প্রবাদপুরুষ, বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, তখন ভারতের ঘরে ঘরে ধ্যানচাঁদ। কৌস্তুভকান্তের পিতৃদেব কিছুই না বুঝে এই নামের বোঝা বহন করেছিলেন, এখনও বহন করে যাচ্ছেন।

কিন্তু ধ্যানচাঁদের থেকে কৌস্তুভকান্তের বোঝার ভার অনেক বেশি। আমাদের পক্ষে সেই ভার সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই আমরা এই অতিক্ষুদ্র গল্পে আর কৌস্তুভকান্ত না লিখে কৌকা লিখব।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জানানোর আছে। কৌকার মা বিয়ের আগে ছিলেন মজুমদার। বিয়ের পরে স্বামীর পদবি জুড়ে তাঁর পদবি হয়েছে দে-মজুমদার। সেই বোঝা এসে পড়েছে কৌকার ঘাড়ে। তার পুরো নাম দাঁড়িয়েছে কৌস্তুভকান্ত দে-মজুমদার।

এবার আসল কথায় আসি, এতবড় একটা নামের বোঝা দিনের পর দিন বহন করে শ্রীমান কৌকার মাথার ভেতরটা কেমন ঝুলঝুল হয়ে গেছে। তবে বুদ্ধি একটু ঝুল হয়ে গেলেও কৌকার কৌতূহলের অন্ত নেই।

সেদিন কৌকার ছোটপিসি, মাত্র কয়েক মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে, কৌকাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, কৌকা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, পিসি, মাসির গোঁফ গজালে কি হবে?'

কৌকার পিসি বুদ্ধিমতী, অনার্সে বি এ পাস, সেকেণ্ডারিতে চারটে লেটার পেয়েছিল। সে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেয়ো না কৌকা, মাসির গোঁফ গজালে আবার কি হবে, মামা হবে। এ কথাটা তো সবাই জানে।'

কৌকা বলল, 'না সে জানা নয়। তুমি আমাকে বলতো পিসির গোঁফ গজালে কি হবে?'

এই প্রশ্নে পিসি বিব্রত বোধ করতে লাগল, মুখে বলল, 'পিসির গোঁফ গজালে আবার কি হবে?'

'তাই তো জানতে চাইছি', কৌকা বলল, 'পিসির গোঁফ গজালে, পিসি কাকা হবে, না বাবা হবে, না জ্যাঠা হবে?'

এই অদ্ভুত প্রশ্নে পিসি রেগে গিয়ে কৌকাকে এক ধমক দিল, 'খুব জ্যাঠামি করতে শিখে গেছো দেখছি।'

কিন্তু জ্যাঠামি নয়, এ হল কৌকার কৌতূহল।

একদিন কৌকা জিজ্ঞেস করল তার বাবাকে, 'বাবা, পথ কোথা থেকে শুরু হয়?' বাবা বলল, 'একেকটা পথ একেক জায়গা থেকে শুরু হয়।' 'যেখান থেকে শুরু হয়, তার আগে আর পথ নেই?' কৌকা জানতে চায়। কৌকার বাবা বলেন, 'তা থাকবে না কেন? অন্য অনেকগুলো পথ হয়তো সেখানে এসে শেষ হয়েছে।'

কৌকা ঠিক ধরতে পারে না। অনেক প্রশ্নোত্তরের পর জিজ্ঞাসা করে, 'তা হলে শেষ পথটা কি পৃথিবীর শেষে চলে গেছে।'

কৌকার বাবা বোঝান, 'পৃথিবী হল গোল, তাই তার কোন শেষ নেই।' কৌকা বলে, 'রসগোল্লা, রাজভোগ, নারকেলের নাড়ু এগুলো তো শেষ হয়ে যায়।'

আজ কয়েকদিন হল কৌকা কিন্তু খুব বেশি প্রশ্নটশ্ন করছে না। তার অপার কৌতূহল নিয়ে সে নিজেই একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছে।

কৌকাদের বাড়িতে একটা খোলা ছাদ আছে। আশ্বিন মাসের রাতে ছাদে উঠে কৌকার বাবা ছায়াপথ দেখাচ্ছিলেন। ছায়াপথ মানে শরৎকালে দুর্গাপুজোর আগে-পরে নীল আকাশে একটা দুধসাদা রাস্তার মত দেখা যায়, তার চারপাশে জ্বলজ্বল করছে হাজার হাজার তারা।

'বাবা, তারাগুলো কত দূরে আছে?' কৌকা প্রশ্ন করে। 'তুমি ভাল করে দেখে ভেবে বলো।' বাবা বলল।

কৌকা অনেক ভেবে বলল, 'এখান থেকে শিবপুর?' কৌকার মামার বাড়ি শিবপুর, দু'বার বাস বদলিয়ে যেতে হয়।

কৌকার বাবা বলল, 'আরও দূরে, আবার ভাবো।'

কৌকা আবার ভাবল। কৌকার পিসির বিয়ে হয়েছে আরামবাগে, সে অনেক দূর। কৌকা বলল, 'আরামবাগের সমান দূর হবে।'

কৌকার বাবা বলল, 'তুমি মোটেই ভাবতে পারছো না। তারাগুলো লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। ওই দ্যাখো সপ্তর্ষিমণ্ডল, ওই দ্যাখো মঙ্গল, ওইখানে অরুন্ধতী, বিশাখা...

কৌকা বাবাকে কথা শেষ করতে দিল না, থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, তারাগুলো যদি এত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে, তা হলে মানুষ ওদের নাম জানলো কি করে?'

কৌকার বাবা প্রশ্নটা শুনতে পায়নি। কিন্তু এর পর থেকে কৌকা শুধু ভাবছে আর ভাবছে মানুষ তারাদের নাম জানল কি করে?

জনৈক নাস্তিক হিন্দু

এই রচনার শিরোনামই ভুল হয়ে গেল। যাঁকে নিয়ে এই অতরল নিবন্ধ লিখতে যাচ্ছি, জীবিতকালে আমি যাঁর অন্ধ অনুরাগী ছিলাম, সেই নোবেল লরিয়েট চন্দ্রশেখর কখনই জনৈক ছিলেন না।

ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল লরিয়েট নেই, বিশ শতকের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ ক্লাব নোবেল বিজয়ী সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের জীবিত সদস্যের সংখ্যা দু'শোর বেশি নয়। এর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও সি ভি রমন এই দু'জন হলেন নিকষ ভারতীয় যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এঁরা ভারতের লোক-জন্মসূত্রে, কর্মসূত্রে এবং মৃত্যুসূত্রে। বাকিরা তা নন, এমন কি মাদার টেরেসাও নন। তবু সদ্যপ্রয়াত চন্দ্রশেখর সম্পর্কে এ কথা বলতে একটু অস্বস্তি লাগছে।

ছয় দশকের বেশি মার্কিন প্রবাসী, মার্কিন নাগরিক চন্দ্রশেখর ছিলেন আপাদমস্তক,আদ্যন্ত ভারতীয়। সিগারেট, মদে নিরাসক্ত, চির নিরামিষাশী এই ভারতীয়, যাঁকে আমেরিকানরা তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তিনি যদি কোথাও কোন ভোজসভায় যেতেন সৌজন্যবশত সেখানে আমিষ বা মদ পরিবেশন হত না।

যৌবনে চন্দ্রশেখর বিদ্যার্জনের জন্য ভারতবর্ষের উপকূল ছেড়ে মার্কিন দেশে গিয়েছিলেন। সেই বিশের-তিরিশের ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'সেটা ছিল স্বপ্ন, আশা ও দেশপ্রেমের যুগ।' এখনকার ভারত বিষয়ে তিনি অবশ্য এ রকম উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। বরং বলা যায়, কিঞ্চিৎ হতাশই ছিলেন।

ভারতীয় ধ্যানধারণা হিন্দু জীবনদর্শন এ সব বিষয়ে সারা জীবনই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই নাস্তিক বৈজ্ঞানিক। যিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন জনৈক হিন্দু বলে, অবশ্য হিন্দুর আগে নাস্তিক বিশেষণটিও যোগ করতেন, নিজেকে বলতেন নাস্তিক হিন্দু।

ভগবানে বিশ্বাস ছিল না চন্দ্রশেখরের। চন্দ্রশেখর বলতেন, ভগবান মানুষের আবিষ্কার। আমরা মানুষেরা তাঁকে উদ্ভাবন করেছি আমাদের সুখ-দুঃখের উৎস হিসেবে।

চন্দ্রশেখরের বক্তব্য ছিল, ধর্ম যদি ঈশ্বরের অনুসন্ধান হয়, বিজ্ঞান হল সত্যের অনুসন্ধান। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ Truth and Beauty, ভারতীয় বোধের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে পরতে পরতে মিলিয়ে দিয়েছে। এ সেই প্রাচীন সত্যম, শিবম, সুন্দরমের উপাখ্যান যেখানে শিব মানে মঙ্গল।

চন্দ্রশেখরের বিজ্ঞানচর্চার স্রোতস্বতী নদী একখাতে প্রবাহিত হয়নি, জলবিজ্ঞান, আকাশ গতি, নক্ষত্র বিদ্যা, ব্ল্যাক হোল—মহাশূন্য চর্চার বিভিন্ন প্রান্তরে সেই নদী জলসঞ্চার করেছে। তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল একজন জ্যোতির্বিদ হিসেবে। হয়ত চিরকালের, চিরদেশের তিনিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ।

কিন্তু সেটাই তাঁর প্রধান পরিচয় নয়। শেষ বয়েসে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'নিছক বিজ্ঞানচর্চা করে আমার ব্যক্তিসত্তার ক্ষতি হয়েছে।'

এটা নিশ্চয়ই সত্যি কথা। এই স্থিতধী, বুদ্ধিমান দক্ষিণ ভারতীয় এঁর হাতের আমলকী ছিল সাহিত্য, গলার নামাবলী ছিল সঙ্গীত, মস্তিষ্কের মনি ছিল অঙ্ক। শুধু তাই নয়, যে-কোন শাস্ত্রে, যে-কোন বিদ্যায় তিনি পারঙ্গম হতে পারতেন, যে পারঙ্গমতা অসাধারণত্বের পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধ্য।

তথাকথিত ভারতীয় স্টাইলে এই কালজয়ী বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমরা একটু অসভ্যতা করেছিলাম। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে তাঁকে পদ্মবিভূষণ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারতরত্ন নয় কেন? চন্দ্রশেখরের পিতৃপ্রতিম স্যার সি ভি রমনকে কিন্তু এই ভারতরত্নই দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রশেখরকে নয় কেন, তিনি ভারতবাসী নন বলে?

সেই উনিশশো উনসত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন সরকারি সম্মান বিতরণের অনুষ্ঠানে।

'আমরা যে চন্দ্রশেখরকে আমাদের দেশে ধরে রাখতে পারিনি সে খুবই দুঃখের বিষয়।'

এর পরেই শ্রীমতী গান্ধী একটি বিপজ্জনক স্বীকারোক্তি করেছিলেন, 'কিন্তু এটাও ভাববার কথা, চন্দ্রশেখর যা করেছেন, এ দেশে থাকলে তা করতে পারতেন কি না?'

পারতেন কি না পারতেন, নোবেল পুরস্কার পেতেন কি না পেতেন, চন্দ্রশেখর দেশে থাকলে আমরা খুশি হতাম। ভগবান যে মানুষেরই রচনা, এ কথা বলার মত মানুষ, হৃদয়বান, বুদ্ধিমান মানুষ আমরা তাঁদের ফিরে পেতে চাই।

চন্দ্রশেখর বলতেন, 'বিজ্ঞানের সাধনা আসলে সুন্দরের সাধনা।' তিনি এ কথাও বলেছিলেন, 'সেই বিজ্ঞানের সাধনাই আমার ব্যক্তিত্বকে বদলিয়ে দিয়েছে।' তাঁর দুঃখ ছিল তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য বা শিল্পে মনোযোগ দেয়ার অবসর পাননি।

আমাদের দুঃখ হল, আমরা তাঁকে কাছে পাইনি।

মহা সপ্তমী : ক্যাম্প, লবণ হ্রদ

ডেটলাইন, পয়লা অক্টোবর, রবিবার, সন উনিশশো পঁচানব্বই। ক্যাম্প লবণ হ্রদ। এই ক্যাম্পে সদ্য এসেছি, মাত্র মাস দুয়েক হয়েছে। বলা বাহুল্য, পুজোয় এখানে এই প্রথম।

গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাক্স-বিছানা কাঁধে করে মহানগরের রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয় খুঁজেছি। কলকাতা শহরের সাতটা থানা আর ডাকঘরের এলাকায় মাথা গোঁজার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও হাবড়া-অশোকনগরে, তার আগে কল্যাণগড়ে আর এই সেদিন চুঁচুড়ায় ঠিকানা হয়েছিল, তবে তখনও কলকাতায় পাকা আস্তানা ছিল।

সেই আস্তানা ছেড়ে অবশেষে অষ্টম বারে কলকাতার এলাকা ছেড়ে বেঙ্গল পুলিশের জিম্মায় চলে এসেছি। এবং এটাও জানি, এটাই শেষ বাসা বদল। আর পৃথিবীর অধিবাসীদের সেই অনিবার্য, অমোঘ গন্তব্যস্থলটি ছাড়া অতঃপর আর কোন যাওয়ার জায়গা নেই।

সে যাই হোক, এ জায়গাটাও খারাপ নয়। ভালই আছি। বিশেষ করে এই পুজোর দিনে টের পাচ্ছি, বেশ ভাল আছি।

কানের কাছে তারস্বরে মাইকের চিৎকার-চেঁচামেচি, ভৌতিক কণ্ঠস্বরের দাপাদাপি নেই। নেই দমবন্ধ ভিড়। চাঁদার অত্যাচারও নেই। ব্লক প্রতি গোনাগুণতি একটি করে পুজো। আজ দুপুরেই পোলাও-পনির সহযোগে সুন্দর নিরামিষ পংক্তি ভোজনে রীতিমত তৃপ্তি পেলাম।

এমনিতেই কলকাতার থেকে এখানে তাপমাত্রা সব সময়ে দুচার ডিগ্রি কম। শব্দদূষণ নেই বললেই চলে। রাস্তায়, বাজারে বা মণ্ডপে লোক গিজগিজ করে না।

এই শরতে বাদা অঞ্চলের মাটি দিয়ে ভরাট লবণহ্রদের আনাচে কানাচে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল ফুটেছে। শিশির ভেজা শেফালির মৃদু সৌরভে ঝিম ঝিম করে শেষ রাতের বাতাস। দূরে শৃগালকুল দলে বেঁধে ডাকে, যেমন ডাকত আমাদের সেই হারানো ছেলেবেলায়।

শুধু কিছুটা ছিঁচকে চোরের উৎপাত আছে। কখনও কখনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পাড়াওয়ারি পাহারাদারেরা যখন একটু এদিক-ওদিক থাকে শোওয়ার ঘরের পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে তাদের মৃদু চরণধ্বনি শুনতে পাই। জানি না স্বপ্নের ঘোরে কিনা একদিন যেন তাদের বাক্যালাপও শুনেছিলাম।

আমার জানালার ওপারে দুজন চোরের দেখা হয়ে গেল। স্পষ্ট শুনলাম, একজন বলছে, "দাদা, ভাল তো?' অন্যজন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, 'আর ভাল? একটা কাঁসার গেলাস, একটা ছাতা, একটা তোয়ালে পর্যন্ত লোকেরা জানলার ধারে কাছে রাখে না। যা ছিঁচকে লোক সব।'

শুনে প্রত্যয় হল, আমরাই শুধু চোরদের ছিঁচকে ভাবি তা নয়, চোরেরাও আমাদের ছিঁচকে ভাবে।

দ্যাখো, আমার এই এক স্বভাব হয়েছে। বার্ধক্যের সীমায় এসে কেমন চপল হয়ে গেছি। মহাসপ্তমীর কথা লিখতে গিয়ে ছিঁচকে চোরের প্রসঙ্গে এসে গেলাম।

তবে মহাসপ্তমীর কথা আর কি বলব। এখন বেলা পাঁচটা। আবহাওয়া অফিসের চোখে ধুলো দিয়ে রোদ ঝলমল করছে আমার বাড়ির পাশে সবুজ পাতায়। কোথাও মেঘ-বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। বৎসরকার এই কয়টা দিন যেন এ রকমই কেটে যায়।

অল্প কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লবণহ্রদ বিষয়ে একটি অনন্য প্রতিবেদন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে আরম্ভ করেছিলেন এই ভাবে,

'ও, ও কোথায়?'

'ও তো সল্টলেকে।'

তা শুধু আমি একাই নই। আমার অনেক আগে থেকে অনেকে সল্টলেকে এসেছে। এর মধ্যে আমার পূর্ব পরিচিত জনের সংখ্যা প্রচুর।

এদেরই একজন দিবাকার এইমাত্র আমাদের বাসায় এল। তাকে দেখে খুশিই হলাম।

দিবাকর এসে করজোড়ে বলল, 'দাদা, শুভ বিজয়া।'

দিবাকরের কথাবার্তা চিরদিনই এই রকম। তবু আমি বললাম, 'আজ সবে সপ্তমী, আজ আবার শুভ বিজয়া কিসের?'

দিবাকর বলল, 'জানেন না এ বছর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী সব তিথি একদিনে পড়েছে।'

দিবাকরের কথা শুনে না হেসে পারা গেল না। পুজোর একটা দিন মারা গেছে। একটা দিন চলে গেল। তবু বিজয়াশুদ্ধ আরও দুটো দিন রয়ে গেছে তাই বা কম কি?

পুজোর আড্ডা আর জমে না

পুজোর আড্ডা? আড্ডার আবার ছুটি-ছাটা, পুজো-পার্বণ কি? আমাদের ছিলো অহর্নিশি, অষ্টপ্রহর আড্ডা। অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের মতো, অখণ্ড, অবিরাম অনলস আড্ডা।

দুপুরে অফিস কেটে দেখা হলো। বিকেল গড়ালো, সন্ধ্যা হলো। তারপর রাতে বাসায় এক বিছানায় গাদাগাদি তিনজন-চারজন। দু'জন ঘুমোয় তো, দু-জন আড্ডা দেয়। পালা করে প্রহর জাগা।

সেই যে সুনীল লিখেছিল, 'দীপক ও তারাপদ, দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়।' এরই মধ্যে গভীর রাতে শক্তির প্রবেশ। তার আর বিছানায় জায়গা হত না। সে বিছানায় জায়গা পেত না। ঘরের কোণায় একটা মাদুর গোটানো থাকত, সে সেটা বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ত। কোন কোন দিন মাদুর বিছানোর দরকার পড়ত না। ঘরে ঢুকেই সটান মেজের ওপর শুয়ে পড়ত।

বিধাতা পুরুষ মানুষের জন্ম মুহূর্তে তার ললাটলিপি লিখে দেন। তাতে লেখা থাকে, ওই লোকটা এই জীবনে এত কেজি চাল খাবে, এতটা মাছ, এতটা মাংস, এতটা পানীয়, এতগুলো সিগারেট। সব কোটা করা থাকে। আড্ডার কোটাও লেখা থাকে, এই লোকটা এই জন্মে এত হাজার ঘণ্টা আড্ডা দেবে।

আমার সন্দেহ হয় আমার এই জীবনে বিধাতা পুরুষ যে আড্ডার কোটা করেছিলেন হয়ত একবারেই ফুরিয়ে গেছে সেই বরাদ্দ। যৌবনে অত্যধিক অপব্যয় করে আজ আমাকে শূন্য ঘরে একা কাটাতে হয়। কোথাও যাওয়া হয় না। গেলেও মনোমত আড্ডা জমে না। সেই যে আড্ডা একদিন ভরদুপুরে শুরু হয়ে পরের দিন রাত পর্যন্ত গড়াত সেই নিরবচ্ছিন্ন আড্ডার পৃথিবী থেকে, সেই গমগমে বান্ধব সমাগমের উষ্ণ উপত্যকা থেকে কবে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি নির্বাসিত হয়েছি।

দুঃখের কাহিনী সাতকাহন করে বলে লাভ নেই। পুজোর আড্ডা নিয়ে কথা, সেটাই বলি।

* * *

পনেরো বছর বয়সে আমি কলেজে পড়তে কলকাতায় আসি। তারপরে বাইশ-তেইশ বছর বয়েস পর্যন্ত কলেজের পুজোর ছুটিতে প্রত্যেক বছর আমি টাঙ্গাইলে মা-বাবার কাছে বাড়িতে গেছি। আমি রীতিমত সাবালক হওয়ার আগে, তখন সাবালক হত একুশ বছর বয়সে। কলকাতার পুজো দেখিনি।

সে সময় বাংলাদেশ হওয়ার অনেক আগের কথা। তখন ভরা পাকিস্তান। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের একটা বড় অংশ তখনো দেশ ছাড়েনি।

দেশে গেলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হত। তিনরকম পুরনো বন্ধু। এক, যারা টাঙ্গাইলে রয়ে গেছে। দুই, মুসলমান বন্ধুরা যারা ঢাকায় পড়তে গেছে। আর তিন, আমার মত যারা কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে পড়তে এসেছে।

এই শেষের দলের, কলকাতায় পাঠরত বন্ধুদের সঙ্গে আমার কিন্তু দেখা হত টাঙ্গাইলেই। কলকাতায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, দেখা সাক্ষাৎ বিশেষ ছিল না।

আমরা তখন বড় হচ্ছি। দ্রুত বড় হচ্ছি। শুধু মাথায়ই বাড়ছি তা নয়। মনে মনেও বড় হচ্ছি। পুজোর মধ্যে সকাল-সন্ধ্যে টাঙ্গাইল কালিবাড়িতে বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে দেখা হত। সেখানে চেয়ারে না হলেও নাট মন্দিরের ফরাসের ওপর আমরা বসার জায়গা পেতাম। চেয়ার ছিল মান্যগণ্য প্রবীণদের জন্যে।

নাটমন্দিরের ফরাস চেয়ারগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছিল না। সে ছিল আমাদের সদ্য জাগ্রত কামনা-বাসনার বয়েস, গোপন ভাব বিনিময়ের বয়েস। চাপা গলায়, অবরুদ্ধ কণ্ঠে আড্ডা তেমন জমত না।

তবে তার জন্য ছিল লৌহজঙ্গ নদের তীরে টাঙ্গাইল পার্ক। সুদীর্ঘ বিদেশি গাছের সারি। পাতার মর্মর, শারদীয় বাতাসে নদীর চরে কাশবনের সাদা ঢেউ। নদীর জলে ঢাকাই নৌকোর দোলানি।

বিকেলে বাঁধা আড্ডা ছিল টাঙ্গাইল পার্কে। খোলামেলা প্রাণভরা আড্ডা। কত স্বপ্ন, কত দুরাশা। যৌবন রহস্যের কত গোপন খবর। নিষিদ্ধ আলোচনা।

তখন আমাদের আজকাল যাকে বলে উঠতি যৌবন, আমরা মেয়েদের দিকে তাকানো শিখছি। আঁখি মেলি যাহারেই ভাল লাগে, তাহারেই ভাল বলে জানি।

অবশ্য আমাদের আড্ডা শুধু নারী শরীরের বা নারী হৃদয়ের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। ভবিষ্যৎ জীবন, রাজনীতি, সিনেমা সবই আমরা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ধরে নিতাম। তবে সাহিত্য বা কবিতা কখনোই নয়। তার জন্য টাঙ্গাইল পার্ক নয়, কলকাতা আছে। আমি বিষয়টা এড়িয়ে যেতাম।

তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল আমার প্রাণের বন্ধু মইদুল। ডাক্তার মইদুল ইসলাম খান। তখনো সে ডাক্তার হয়নি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। বৎসরান্তে ওই ছুটির মধ্যে দেখা। আমাদের দ্বৈত আড্ডার কোনও বিরাম ছিল না। ক্লান্তি ছিল না।

সবচেয়ে মজা হত রাতে। আমাদের বাড়ি থেকে মইদুলদের বাড়ি প্রায় আধমাইল দূরত্ব। ছায়া-ছায়া অন্ধকার রাস্তা দিয়ে একটা মজা খালের ওপরে [illegible]র সাঁকো পার হয়ে যেতে হত।

আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে রাত সাড়ে আটটা, নটা হয়ে যেত। আমি একটা ল[illegible] হাতে করে মইদুলকে এগিয়ে দিতে যেতাম। এগিয়ে দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন [illegible]ল তা নয়,. যেতাম ওই শুধু আরও একটু কথা বলার জন্যে।

কিন্তু একবার এগিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা শেষ হত না। আমি মইদুলের [illegible] পর্যন্ত মইদুলকে এগিয়ে দিলাম। এবার মইদুল তার বাসা থেকে আমাকে আমাদের [illegible]া পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

রাত দশটা বেজে যেত। আমি মইদুলকে নিয়ে যাচ্ছি, মইদুল আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সেই চলমান আড্ডা মা ভেঙে দিতেন। একজন মুহুরিবাবুকে ডেকে মইদুলকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলতেন আর আমাকে বলতেন, 'রান্নাঘরে অনেকক্ষণ পিঁড়ি পাতা হয়েছে। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, যাও হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস।'

মইদুলের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল উনিশ'শো আটাত্তর সালে। আমেরিকায় বাফালোতে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে এখন একজন যশস্বী চিকিৎসক। মার্কিন দেশেই বিয়ে করে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে।

উনিশ শো ষাটসালের পরে মইদুল দেশে আসেনি। আমি অবশ্য গত বছরও টাঙ্গাইল গিয়েছিলাম। বছর কয়েক আগেও পুজোর ছুটিতে টাঙ্গাইলের বাড়িতে গিয়ে থেকেছি।

অধিকাংশ নতুন মুখ। তারা অনেকে আমাকে চেনে, আমি কাউকে চিনি না। তাদের সঙ্গে আমার বয়েস এবং রুচির দূরত্বও বিরাট।

সুতরাং পুজোর আড্ডা আর জমেনি।

আর কোনদিন জমবেও না।

পরমা পার্ক স্ট্রিট

ভুলে-ভরা কলকাতা নিয়ে গান বেঁধেছিলেন দাঠাকুর, সেকালের জঙ্গিপুরের বিখ্যাত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি বিদূষক পত্রিকার সম্পাদক শরৎচন্দ্র, যাঁকে 'ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর পেলেন 'চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র' এই সম্বোধনের মাধ্যমে।

তা, দাদাঠাকুরের সেই ভুলে-ভরা কলকাতার তালিকা খুবই দীর্ঘ ছিল। সেই কলকাতায় গোলদীঘি গোল ছিল না, লালদীঘির জল লাল ছিল না, বৌবাজারে বৌ পাওয়া যেত না। দাদাঠাকুর এখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তিনি অবশ্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রবণতায় ভুলে-ভরা কলকাতার তালিকায় আরও একটি নতুন ভুল যোগ করতেন। সেই ভুলটি হল, এখনকার পার্ক স্ট্রিটে নো পার্কিং, পুলিশ গাড়ি দাঁড়াতে দিতে চায় না। পাশাপাশি দুটো সাইন প্লেট 'পার্ক স্ট্রিট' এবং 'নো পার্কিং'।

মার্কিনীরা শহরের প্রাণকেন্দ্রকে ডাউন-টাউন বলে, সেই অর্থে কলকাতার ডাউন-টাউন দক্ষিণে, পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু যার শেষ বি বা দী বাগে।

পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বহুকালের। সেই গত জন্মে, উনিশশো একান্ন সালে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছিলাম, উঠেছিলাম ছোট মাসিমার বাড়িতে, এসপ্ল্যানেডে মেসোমশাইয়ের সরকারি কোয়ার্টারে। সেখানে টানা ছয় বছর, সেই সাতান্ন সাল পর্যন্ত।

কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ওয়েলেসলি স্ট্রিটের সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে ; সেই রাস্তা ও সরকারি, কলেজ উভয়ই নাম বদল করে এখন হয়েছে যথাক্রমে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড এবং মৌলানা আজাদ কলেজ।

সে যাক আমার বাসস্থান ও শিয়ালদহের চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল পার্ক স্ট্রিট। অবশ্য এসপ্ল্যানেড ছেড়ে চলে আসার পরে বৎসরাধিক কাল ছিলাম গোখেল রোডে, সেও পার্ক স্ট্রিটের কাছেই।

পরে আবার পার্ক স্ট্রিটের কাছেই বাস করেছি মধ্য যৌবনে আশির দশকের প্রায় পুরোটা, আর তারপরেও এই নব্বুইয়ের দশকের প্রথম আড়াই বছর।

ছিলাম লিটল রাসেল স্ট্রিটে। পার্ক স্ট্রিটের শাখা গলি, অবশ্য বেশ চওড়া রাস্তা, রাসেল স্ট্রিট বেরিয়েছে পার্ক হোটেলের বিপরীত দিক থেকে, রাসেল স্ট্রিটেরই উপশাখা হল লিটল রাসেল স্ট্রিট, এখন রাসেল স্ট্রিট-লিটল রাসেল স্ট্রিট দুটো রাস্তারই নাম বদলিয়ে গেছে লিটল রাসেল স্ট্রিট বোধহয় হয়েছে নন্দলাল বসু সরণি।

বেশ কিছুদিন হল নামটা বদল হয়েছে। আমি থাকতে থাকতেই। কিন্তু আমি কখনও নন্দলাল বসু সরণি লিখিনি, লিটল রাসেল স্ট্রিটই লিখেছি।

এই নাম বদলের ব্যাপারটা অতি জঘন্য। ইতিহাসবোদের অভাব থেকে এ রকম ঘটে, অশিক্ষিত মানুষের সস্তা রাজনৈতিক চাল রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টানো। কলকাতায় প্রায় সমস্ত বিদেশি নামের রাস্তাঘাটের নাম বদলানো হয়ে গেছে, শুধু পার্ক স্ট্রিটের নাম কেন যে বদলায়নি। অনায়াসেই পার্ক স্ট্রিটের নাম বদল করে প্রদীপ কুন্দলিয়া স্ট্রিট অথবা কানোরিয়া-বাজোরিয়া সরণি করা যেত, ব্যাপারটা খুব বেমানান বা হাস্যকর হত না, সামনের রাসেল স্টিটের নাম বদল হয়ে আনন্দলাল পোদ্দার সরণি হয়েছে।

অবশ্য এই রাস্তার নাম বদলানোর ব্যাপারে আমার একটা প্রস্তাব আছে। নাম বদলের বিষয়ে সংখ্যালঘু কোটা (যেমন ওয়েলেসলি থেকে রফি আহমেদ কিদোয়াই) মোটামুটি পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিদের কোটার দিকে নজর রাখা হয়নি। এখন আবার ও বি সি আছে, এক-তৃতীয়াংশ মহিলা নামের ব্যাপারটাও এসে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নও হতে পারে। যদি তাই হয়, আমার প্রস্তাব হল পার্ক স্ট্রিটের নাম বদল করতে হল তার যেন নতুন নামকরণ হয় 'কাননবালা সরণি'।

ঠিক আজকের পার্ক স্ট্রিটে, বহুতল দালানের ভিড়ে খবরের কাগজের ভাষায় কংক্রিটের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আমার এই নামকরণ ঠাট্টা বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু এই সেদিনও পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বাগানের অভাব ছিল না। আশির দশকের গোড়ায় আমরা যখন লিটল রাসেল স্ট্রিটে যাই, তখনও পাড়াভর্তি এক বিঘে, দু'বিঘে জমির কম্পাউন্ডওয়ালা বাগান-ঘেরা সব দোতলা-তিনতলা বাড়ি।

সে-সব বড় বড় বাগান পরিচর্যা করার লোক তখন আর ছিল না। উঠোনে বুনো ঘাস আর জংলি লতার রাজত্ব। তবু তারই মধ্যে পল্লবিত মাধবী জানালা বেয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রথম বৃষ্টিতে কামিনী ফুলের সৌরভে সারা পাড়া আনচান। শীতের শেষে মুকুল আসে বুড়ো আমগাছে, কয়েকটা কোকিল আর ইষ্টিকুটুম পাখি কোথা থেকে চলে আসে। জমজমাট হয়ে ওঠে বসন্তবাহার।

পার্ক স্ট্রিট ছাড়া চারদিকের রাস্তাঘাট সন্ধ্যা না হতেই ফাঁকা, গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন বিশেষ নেই। রাত দশটার আগেই শুনশান হয়ে যায় চারদিক।

প্রথম থিয়েটার রোডে একটা এ সি মার্কেট হল। একটা বহুতল বাড়ি উঠল ক্যামাক স্ট্রিটে। এখন তো পার্ক স্ট্রিটের পাড়া জুড়ে এ সি মার্কেট আর স্কাইক্র্যাপারের ছড়াছড়ি।

পার্ক স্ট্রিট বলতে যা বোঝায় সে অবশ্য চৌরঙ্গী রোড থেকে উড স্ট্রিটের সীমা পর্যন্ত। দক্ষিণে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ আর উত্তরে পার্ক স্ট্রিট থানা এই পর্যন্ত রঙ্গিলা পার্ক স্ট্রিট। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট বেশ লম্বা রাস্তা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছাড়িয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের জোড়, লোকে বলে মল্লিকবাজার। সেই মল্লিকবাজার থেকে ট্রামলাইন ধরে পার্ক সার্কাস ময়দান, সেখান থেকে আরও আধ কিলোমিটার একেবারে চার নম্বর পুল পর্যন্ত।

এই যে দীর্ঘ পার্ক স্ট্রিট যাকে বলা যায় কলকাতার প্রমোদ সরণি এই রাস্তায় কিন্তু

কোন নাট্যশালা নেই, রঙ্গমঞ্চ নেই। একটা মাত্র সিনেমা হল আছে, সেটাও মূল পার্ক স্ট্রিটে নয়, পার্ক সার্কাস ট্রাম রাস্তায়।

পার্ক স্ট্রিটের যেটুকু প্রসিদ্ধি সে হল এর অভিজাত এবং ঝলমলে হোটেল ও বারগুলির জন্যে। অলিম্পিয়া, ব্লু ফক্স, মোগাম্বো, স্কাইরুম এগুলি বহুদিনের পুরনো।

আমরা প্রথম যৌবনে হাতে পয়সা থাকলে অলিম্পিয়ায় আড্ডা দিয়েছি। পানীয়ের সঙ্গে সসেজ এবং ওমলেটের প্লেট যুবক বয়সের রসনায় প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে।

অলিম্পিয়ার আড্ডা ছিল অতি উচ্চমানের। নাক উঁচু বুদ্ধিজীবীরা সেখানে আসতেন। আমি সমর সেন, নিরঞ্জন মজুদমার, অমলেন্দু দাশগুপ্ত এবং হামদি বে কে ওখানে দেখেছি।

আমি আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার অলিম্পিয়ায় গেছি। কয়লা খনির সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত কর্মকর্তা অমিতাভ মুখার্জি উদার হস্তে আমাদের আপ্যায়ন করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনীমালার বহু আগে অমিতাভ মুখার্জির সত্যিকারের ডাকনাম ছিল ফেলু, আমরা বলতাম ফেলুদা।

একবার শক্তি অলিম্পিয়ায় খুব গোলমাল করেছিল। পরে অলিম্পিয়া কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে দেন যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আর এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

অলিম্পিয়ায় একতলা ছিল, সম্ভবত এখনও আছে নারীবর্জিত। শুধু মাঝে-মধ্যে নিরঞ্জন মজুমদারের স্ত্রী একটু বেশি রাতে আসতেন নিরঞ্জনবাবুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

অলিম্পিয়ার দোতলায় পারিবারিক পানভোজনের আয়োজন ছিল। সস্ত্রীক এবং সপুত্র সেখানে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অনেক মনোরম সন্ধ্যার স্মৃতি আমার রয়ে গেছে।

আমার প্রিয় বন্ধু সুরসিক হিমানীশ গোস্বামী বিলেত থেকে ফিরে আসার পর উত্তর কলকাতার উপান্তে বাস করতেন। আমি নিজে তখন দক্ষিণী।

হিমানীশ দুয়েকদিন বালিগঞ্জ-গড়িয়াহাটায় ঘুরে গিয়ে বললেন, 'সাউথ ওপেন'।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'এর মানে কি?'

হিমানীশ বলেছিলেন, 'দক্ষিণ খোলা। সেই জন্যে দক্ষিণের মেয়েদের গায়ে জামাকাপড় বিশেষ থাকে না, তারাও খোলামেলা।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে তখন সদ্য হাতকাটা ব্লাউজ এবং নাভির নিচে নামিয়ে শাড়ি পরার যুগ শুরু হয়েছে।

এই হিমানীশ স্মৃতির বছর কুড়ি পরে ওই পার্ক স্ট্রিটে এক সন্ধ্যায় জনৈকা সদ্য যৌবনাকে মুখোমুখি দেখেছিলাম, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতই তার অতি অপ্রতুল পোশাক।

মেয়েটিকে আমি চিনি, তার মা-বাবাকে আরও ভালভাবে চিনি। আমার সামনাসামনি হতে তাকে আমি অভিভাবকীয় কণ্ঠে বললাম, 'এ কি রকম জামাকাপড় পরে রাস্তায় বেরিয়েছ, তোমার মা জানতে পারলে কি বলবেন?'

মেয়েটি খুব কাঁচুমাচু হয়ে গেল। মাথা নিচু করে বলল, 'আংকেল একটা স্মল রিকোয়েস্ট। মাকে কিন্তু কখনও বলবেন না। এটা আসলে মায়ের পোশাক, মা বাসায় নেই বলে আমি সুযোগ পেয়ে পরে বেরিয়েছি। মা কিন্তু জানতে পারলে হেভি কাণ্ড করবে।'

এ ধরনের কথোপকথন কলকাতায় শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিটেই সম্ভব।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা রম্য সাহিত্যের আলোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ করতেই হবে। গদ্য এবং পদ্য এই দুইয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিদ্যাসাগর পরবর্তী যুগে যে মুষ্ঠিমেয় লেখকদের হাতে গড়ে উঠেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি এখনও সুখপাঠ্য। দেড়শ' বছরের ব্যবধানে আজও সেই কবিতাগুলি পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূল লক্ষ্য ছিল সেকালের মেকি সাহেবিয়ানা, যা উনিশ শতকের অভিজাত এবং শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রায় কদাচার হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাঙালির এই ঈঙ্গবঙ্গ উপসর্গ ঈশ্বর গুপ্তের চাঁদমারি।

প্রথমে একটা উদাহরণ দেই,

'একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাল নিয়া, একদিকে কোলাকুলি আয়োজন নানা আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা।'

বাঙালি ললনা যখন ইংরেজি লেখাপড়া প্রথম শুরু করল, তখন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—

'তখন এ-বি শিখে, বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।

এখন তারা কি আর শক্তি নিয়ে সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।'

এই কবিতাতেই ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন, 'সব, কাঁটাচালা ধরবে শেষে পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে। ও ভাই, আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে পাবেই পাবেই দেখতে পাবে, এরা, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।'

বগিগাড়ির দিন বহুকাল অতিক্রান্ত হয়েছে ; কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

তাঁর কবিতায় আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাদেশিকতা। সেই বহুবিখ্যাত পংক্তি, 'দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'

ইংরেজ সম্পাদক অর্থাৎ সাদা চামড়ার সাহেব সম্পাদকের প্রসঙ্গে অসাধারণ উক্তি করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত।

'এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক সাদা, সকলেই আমাদের বড় ভাই-দাদা।'

বিচিত্র সব বিষয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি। ফলমূল, মাছ-মাংস, কিছুই বাদ যায়নি। তপসে মাছ কিংবা আনারস নিয়ে তাঁর কবিতা বহুপঠিত। স্কুলপাঠ্য বইয়ের সৌজন্যে পুরুষানুক্রমে বাঙালি ছাত্র তাঁর কবিতা পাঠ করে এসেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন সামান্য লোক ছিলেন না। সংবাদপত্র সম্পাদনায় বাংলা ভাষায়

তিনি একজন পথিকৃৎ। তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' সেকালের একটি প্রিয় সংবাদপত্র। যার প্রধান আকর্ষণ ছিল ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বহুল গদ্য।

বঙ্গিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির ওপরে গালি-গালাজ করিতেন। মেকির উপরে যথার্থ রাগ ছিলো। মেকিবাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন। মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা 'নস্য-লোসা দধি-চোষার' দল গালি খাইতেন।'

ঈশ্বর গুপ্ত শুধু সাহিত্যিক বা কবি ছিলেন না। এক অর্থে তিনি ছিলেন সাহিত্যগুরু। তাঁর প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বর গুপ্তই বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, পদ্যের চেয়ে গদ্যই তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। উপদেশ দিয়েছিলেন, সরল ভাষায় লিখতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তিনি সদাই হাস্যবদন। মিষ্টি কথা, রসের কথা, রসের হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য ও ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না।'

হাসবার কিছু নেই

'ওর নাম গণেশ হালদার। দর্জিপাড়ায় ওর মামার বাড়ি। সেখানেই সে থাকত। তিন বছর পরীক্ষায় ফেল করার পর সে উদাস হয়ে সংসার ত্যাগ করে নেপাল চলে যায়। তারপর নেপাল ছাড়িয়ে তিব্বতের দিকেও যাওয়ার তার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কম্পাস না থাকায় পথ ভুল করে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই সে আবার ফিরে আসে।'...

যাঁরা বাংলা হাসির রচনা পড়েন, হিমানীশ গোস্বামীর লেখার সঙ্গে তাঁদের অবশ্যই পরিচয় আছে। এবং উদ্ধৃত অংশটি যে হিমানীশবাবু ছাড়া আর কারও পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, সেটা তাঁরা জানেন।

শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী রসসাহিত্যিক। এক অর্থে এখনকার বাংলা সাহিত্যে তিনি অতুলনীয়। সরস রচনায় বুদ্ধি ও রুচির এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় না। অবশ্য আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত। আমার পক্ষে তাঁর অধিক প্রশংসা করা অসমীচিন হবে।

প্রায় চল্লিশ বছর হাসির গল্প লিখছেন হিমানীশ গোস্বামী। 'অপদার্থ' নামে তাঁর একটি হাসির গল্পের সংকলন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংকলনেরই একটি গল্প 'হাসবার কিছু নেই', সেখান থেকে প্রথম অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

ওই 'হাসবার কিছু নেই' গল্পের আরেকটি অংশ :—

...'মাছওয়ালা একজনের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা মাছের লেজ বার করে নিল। তাতে সে লোকটি হাঁ হাঁ করে বলে উঠল, এ লেজ আমার....। মাছওয়ালা বলল, কে বলল এটা আপনার লেজ--আমার লেজ এটা। আমাকে ল্যাজে খেলাবেন না; ভাল হবে না বলছি।'...

এই বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হল, 'সতীনাথ সৎ হলেন'। এখানে সৎ অর্থে সতীর বিপরীত লিঙ্গ সৎ। যেমন সতীদাহ করা হয় তেমনিই স্ত্রী বিয়োগের পর সতীনাথ নামক এক যুবককে সৎ-দাহ করা হল। এমন মর্মান্তিক হাসির গল্প কদাচিৎ লেখা হয়। সতীদাহের বিষয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সিনেমা-নাটক, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কিছু কম নেই কিন্তু হিমানিশ গোস্বামীর 'সতীনাথ সৎ হলেন' সেগুলোর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এক অনন্যসাধারণ গল্প।

যে-কোন হাসির গল্পের লেখক যে সব বিষয় নিয়ে সাধারণত লেখেন তার অধিকাংশই গতানুগতিক ও বস্তাপচা। এবং বহুক্ষেত্রে আনধুনিকও বটে।

হিমানীশ গোস্বামীর বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি পুরোপুরি আধুনিক। তাঁর রচনার ফাঁকে উঁকি দেয় এক শিক্ষিত, পরিশীলিত আধুনিক মন ও চিন্তা। তাই 'পটলখুড়োর গঙ্গাযাত্রা' কিংবা 'হোঁদলমামার হাতটান' জাতীয় লেখা তিনি লেখেন না। তাঁর গল্পগুলির নাম পড়লেই হিমানীশবাবুর মনের চেহারা পাওয়া যায়।

দু'একটি গল্পের নাম খুবই অর্থব্যঞ্জক। যেমন, 'পয়লা এপ্রিল যতই এগিয়ে আসে', 'হাত দেখে যতটুকু বলা যায়', 'বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল লেখক হউন' এবং 'বাড়ির কুকুর আমাকে কামড়ায় না।'

বলাবাহুল্য, আমি হিমানীশবাবুর গল্পগ্রন্থের আলোচনা করতে বসিনি। সে যোগ্যতা আমার নেই। আমি মোটেই নির্ভরযোগ্য সমালোচক নই।

বরং আর একটু গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজা করি। পাঠক-পাঠিকা হিমানীশ গোস্বামীর বিচিত্র রচনার আস্বাদ পাবেন এর মধ্যে :-

(এক) বুথ দখল করা তো সর্বত্র সম্ভব নয়। কেননা, কিছু কিছু বুথ তো ওরাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই দখল করবে।

(পুরনো কাসুন্দি)

(দুই) আমি বললাম, 'কি রকম আন্দাজ খরচা পড়ে একটা বিপ্লবে?'

মেয়েটি বলল, 'এ আবার কি বোকার মত প্রশ্ন?'

আমি বলল, 'আপনারা চাঁদা তুলছেন বিপ্লবের জন্যে কেমন কিনা?'

'হ্যাঁ, তা তুলছি।'

'তা আপনাদের নিশ্চয় ধারণা আছে যে, চাঁদা তুলতে হবে। অর্থাৎ কত টাকা আপনাদের বিপ্লবে খরচ হবে।'

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

অবশেষে হিমানীশের একটি চমকপ্রদ গল্পের সারাংশ বলি।

গল্পটি আর কিছু নয়, সেই যে পাঁজিতে বিজ্ঞাপন বেরুত 'সেবনের পূর্বে ও পরে।' অমুক সালসা সেবনের পূর্বে এই লোকটির এই চেহারা ছিল, খাওয়ার পরে এই তাগড়াই চেহারা হয়েছে।

হিমানীশের গল্পটি ঠিক উল্টো। একজন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান লোক একটা টনিক খাওয়ার পর চেহারা একদম বসে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই লোকটির ছবি দিয়ে ওই টনিকের বিজ্ঞাপন বেরুল, 'সেবনের পূর্বে ও পরে', তবে যে ফটোগ্রাফ দুটো ব্যবহার হল সে দুটো উল্টিয়ে দেওয়া হল।

সেবনের পূর্বের স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছবিটি দেওয়া হল সেবনের পরে হিসেবে এবং সেবনের পরেরটা এল সেবনের পূর্বে।

হিমানীশ গোস্বামী ছাড়া এমন প্লট কে কল্পনা করবে?

স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যের কোন আলোচনা স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ করা যাবে না।

ঠিক ব্যঙ্গ নয়, বিদ্রূপ ও শাণিত আক্রমণ রীতিমত তীক্ষ্ণ ভাষায় শ্লেষ বিবেকানন্দের কলমে অনায়াস ছিল। তাঁর সব আক্রমণই ছিল ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।

প্রথমে একটি বিখ্যাত গল্প দিয়ে শুরু করি। এই গল্পটি তো সবাই জানেন। গল্পটি রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের আত্মকথামূলক 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' রচনায়।

গো-রক্ষা আন্দোলন কোন নতুন কিছু ব্যাপার নয়। বহুকাল ধরে, বিশেষ করে ইংরেজ আমলের মধ্যভাগ থেকে গো-হত্যার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন কট্টর হিন্দুরা করে যাচ্ছেন।

এক গো-রক্ষা সমিতির সদস্যেরা দল বেঁধে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এসেছেন চাঁদা তুলতে। এ ব্যাপারে বিবেকানন্দ যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু মুখে সে কথা না বলে তিনি গো-রক্ষা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁদের কাছে বিবেকানন্দ জানতে চাইলেন, সমিতির কার্যকলাপ কি, উদ্দেশ্য কি? চাঁদা কিরকম উঠছে সেটাও জানতে চাইলেন।

ফলে গো-রক্ষা সমিতির সদস্যেরা রীতিমত উৎসাহিত হয়ে তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যবিবরণী স্বামীজিকে বোঝাতে লাগলেন। তখন বিবেকানন্দ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'মধ্য ভারতে দুঃর্ভিক্ষে নয় লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে, আপনারা এই দুর্ভিক্ষের সময় সেখানে কিছু সাহায্য করেছেন কি?'

গো-রক্ষা সমিতির সদস্যেরা জানালেন, 'গো-মাতাকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ। মানুষকে বাঁচানর কাজ আমাদের নয়।' শুধু এই নয়, এরপর তাঁরা বললেন, 'মানুষ মরছে তার পাপের ফলে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

বিবেকানন্দ এবারে রেগে গিয়ে বললেন, 'গো-মাতাও নিজ নিজ কর্মফলে মরছে, ওতে আমাদের কিছু করবার নেই।'

একথায় কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে গো-রক্ষা সমিতির প্রচারক বললেন, 'কিন্তু শাস্ত্রে বলে গরু আমাদের মাতা।'

সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, 'তা না হলে এমন সব-কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

শুধু গো-মাতা নয়, কাশী-বৃন্দাবনের দেবতারাও, বিশেষ করে দেবতার পূজারীরা বিবেকানন্দের কঠোর শ্লেষ ও কটাক্ষের বিষয়।

বিবেকানন্দের একটি রচনা থেকে দুই ছত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

(এক) '.....আজ ঘন্টা হলো। কাল তার উপর ভেঁপু হলো। পরশু উপর চামর হলো। আজ খাট হলো। কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রুপো বাঁধান হলো। আর লোকে খিচুড়ি খেলে।'....

(দুই) ....ঘন্টার ওপরে চামর চড়ান নয়। আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘন্টা বসবো, এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির ব্যাটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন...., পাগলা গারদ দেশময়।'

কাশী-বৃন্দাবনের মন্দিরগুলিকে পাগলা গারদ বলার সাহস শুধু এই নির্ভীক সন্ন্যাসীরই ছিল। এমনকি রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকেও তিনি রীতিমত এক হাত নিয়েছেন—

'....কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না। সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে টানাটানি— রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন ; আর আষাঢ়ে গাল-গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও, খালি পাগলামি।....'

* * * * *

একবারে হল না। বিবেকানন্দের কথা আরও একবার লিখতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ (দুই)

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভারতীয়তা, এক উদাত্ত প্রচারক এবং সফল কর্মযোগী রূপে।

বিবেকানন্দের কথা উঠলেই আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে ঃ-

'হে ভারত ভুলিয়ো না। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অসহায়...।' ভাবা কঠিন, ভাবা অসম্ভব এক সুরসিক বিবেকানন্দ তথা নরেন দত্তকে, যিনি পুরনো কলকাতার এক কুলীন কায়েত, যাঁর অসামান্য রসবোধ তাঁর সন্ন্যাসজীবনের গৈরিক বসনকে উজ্জ্বলতর করেছিল।

শ্রীমতী করজার নাম্নী বিবেকানন্দ অনুরাগিণী এক লেখিকার 'নিউ ডিসকভারিস' নামক গ্রন্থের এই খণ্ডকাহিনীটি ধরা যাক।

একবার এক মেমসাহেবকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন। 'জানেন আমার জীবনের প্রবলতম প্রলোভন এসেছিল আমেরিকায়।'

স্বামী বিবেকানন্দের এই রকমের স্বীকারোক্তি শুনে স্বভাবতই, আর দশজনের মত, এই মেমসাহেবও খুব কৌতূহলী হয়ে পড়লেন, তিনি স্বামীজীকে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করলেন, 'সেই মহিলাটি কে, বলুন না, স্বামীজী?'

এই প্রশ্ন শুনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সেই বিখ্যাত অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন, তারপর বললেন, 'না, না, কোন মহিলা-টহিলা নয়, আমার ছিল সংগঠন গড়ে তোলার প্রলোভন।'

বিবেকানন্দ বিষয়ক রচনা অনেক রয়েছে, এখনও লেখা হচ্ছে। একশো বছর পরে বিবেকানন্দকে পুণর্মূল্যায়নের এখন প্রয়োজন পড়েছে।

প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা থাক। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব রচনায় যাচ্ছি।

....'একটা তামাশা দেখ।

ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, ...এক গালে চড় মারলে আরেক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি। দুনিয়াটা এই দু'চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে।

...আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর। শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্‌টা সমঝালি রাম' হল।

ওরা ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।..মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে।

আর আমরা কোণে বসে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনী দলগত জলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনম অতিশয় চপলম্।'

মোহ মুদ্গর গাচ্ছি, আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেধোচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই তাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে।'....

অবশেষে বিবেকানন্দের একটা চিঠির উল্লেখ করি।

একটি ব্যক্তিগত পত্রে স্বামীজী লিখছেন,

'কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়াছেন, ...তাঁহার গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা।...শিব! শিব!

যাঁহার বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না। আর আমার তিনকালে শ্বশুর মোটেই নাই।'...

চিরকুমার, চিরব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর শ্বশুর নিয়ে এই রসিকতা অবিস্মরণীয়।

বোধ হয় আর বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই। তবে বিবেকানন্দের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার সূত্রে স্বর্গীয় পরিমল গোস্বামীর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের শেষে পরিমল গোস্বামী বলেছেন,

'কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যঙ্গ রচয়িতা রূপে স্মরণ করা হয়নি। এবং তা সম্ভবত এই জন্যে যে, ইতিহাস লেখকেরা সম্মানিত ধর্মপ্রচারককে ব্যঙ্গ লেখকের মতো ঘৃণ্য এবং অসম্মানজনক আসনে টেনে নামাতে অনিচ্ছুক।'

পরিমল গোস্বামী স্বয়ং সফল ব্যঙ্গ লেখক ছিলেন, তাই ব্যঙ্গ লেখক প্রসঙ্গে ঘৃণ্য এবং অসম্মানজনক শব্দ দুটি ব্যবহার করতে তাঁর সঙ্কোচ হয়নি।

ওয়ার্ক কালচার

॥১॥

কোন অফিসের বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার অফিসে কতজন লোক কাজ করে?'

প্রশ্নটা সরল প্রকৃতির, নিতান্তই সংখ্যানৈতিক। বললেই চুকে যেত, 'আশি, একশো কি দেড়শো লোক কাজ করে।'

বড়কর্তা কিন্তু এমন সোজা উত্তর দেননি। সাধে কি আর তিনি বড়কর্তা। তিনি বলেছিলেন, 'তা প্রায় শতকরা পঞ্চাশজন কাজ করে।' মানে দাঁড়াল, তাঁর অফিসে যতজন লোক আছেন, তার অর্ধেক কাজ করেন আর বাকি অর্ধেক কোন কাজ করেন না।

এ কথা জানার পরে কেউ হয়ত বলতে পারেন, 'এই বড়কর্তা অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি এমন অনেক অফিস আছে যেখানে শতকরা পঁচিশজন লোকও মানে তিন-চতুর্থাংশ লোক কোন কাজ করেন না।'

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম আছে। এমন অনেক অফিস আছে যেখানে একজনও কোন কাজ করেন না। কিন্তু সেটা তাঁদের দোষ তা বলা যাবে না, কার্যকারণবশত সেখানে কোন কাজ নেই। কলকাতায় প্লেগের অফিসে তিরিশ বছর কোন কাজ ছিল না। ম্যালেরিয়া অফিস বেকার ছিল প্রায় কুড়ি বছর। কিন্তু অফিস, পদ, মাস শেষের বেতনাদি সবই ছিল, এমন কি ভাল কাজের জন্য এইসব কাজহীন অফিসে প্রমোশনও হয়েছে।

হঠাৎ বহুকাল বাদে প্লেগভীতি এবং তারপরে ম্যালেরিয়া আতঙ্ক এসে এইসব অফিসে হুলুস্থূল পড়ে গেছে। সবাই অবাক হয়ে জেনেছে, এইসব অফিস এতকাল ধরে দেশে ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা, এইসব অফিসের কর্মচারীরা এতদিন কি করতেন।

অনেক জেলায় এখনও আছে কি না জানি না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাংকি অফিসার (Monkey Officer) কিংবা ওই জাতীয় নামের একটা পদ ছিল। সেই পদের একজন রীতিমত গাদাবন্ধুকধারী অধিকারিও ছিলেন।

মাংকি অফিসার কোন প্রতীকী পদার্থ নয়, সত্যিই বানরের অফিসার। না, বানরের দেখাশোনা, দেখভাল, পরিবার-পরিকল্পনা, পুনর্বাসন এসব এই অধিকারির কাজ নয়, এই ব্যক্তি বানর সংহার অফিসার। শস্যখেতে বা জনপদে কোথাও অতিরিক্ত বানরের উৎপাত দেখা দিলে এঁর কাজ হল সেই বানরকে গুলি করে হত্যা করে বিনাশ করা। বলা বাহুল্য, কাজ করার সুযোগ এঁদের জীবনে কদাচিৎ আসে। আমি একবার এর বানর অধিকারির দেখা পেয়েছিলাম, যাঁর গাদাবন্দুকের চওড়া নলে বোলতা বাসা বেঁধেছিল।

তাই বলে কি এই ভদ্রলোকের কোন কাজ ছিল না। না, তা নয়। প্রত্যেক সপ্তাহে ওপরওয়ালা মারফত হেড অফিসে রিটার্ন পাঠাতে হত। আগের সপ্তাহ, আগের মাস

পর্যন্ত কতগুলো বানর নিধন করা হয়েছে। এ সপ্তাহে বানরের অত্যাচারের খবর কতগুলো এসেছে। এ সপ্তাহে ঠিক কতগুলো বানর মারা গেছে কি না এবং সেক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এইরকম চতুর্দশপদী রিটার্ন।

স্বাভাবিক কারণেই ভদ্রলোক জিরো রিটার্ন পাঠাতেন, মানে সবই শূন্য, শূন্য। ভদ্রলোকের ওপরওয়ালারা চোখবুজে আরও পঞ্চাশটা সাপ্তাহিক রিটার্নের সঙ্গে সেটার নিচেও একটা সই করে দিতেন।

সেই রিটার্ন হেড অফিসে যেত। কোনটার রিটার্ন পাঠাতে গাফিলতি হলে, কখনও কখনও মাস তিনেকের মাথায় রিমাইণ্ডার আসত। কালেভদ্রে গুরুতর গাফিলতি হলে অর্থাৎ একাধিকবার রিটার্ন না গেলে হেড অফিসের বড় সাহেব ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে হুমকি দিতেন, 'ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না।'

দুঃখের বিষয়, কেউ কখনও খতিয়ে দেখতেন না ব্যাপারটা কি, কিসেরই বা রিটার্ন? দায়সারা গড্ডালিকাপ্রবাহ চলছে তো চলছেই।

টাক্কাভি ঋণ নামে এক প্রাগৈতিহাসিক কৃষিঋণ ছিল, বহুকাল হল সে আপদ চুকেছে। কিন্তু দশ বছর আগেও একটা অফিসে দেখেছি, সেই ঋণদানের ও আদায়ের পৌনঃপুনিক অতি জটিল মাসিক রিটার্ন অফিস ছুটির পর বড়বাবুর সঙ্গে বসে কেরানিবাবু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই রিটার্ন মেলাচ্ছেন। মেলাচ্ছেন মানে বহু পুরনো বাতিল হিসেবের সঙ্গে সাম্প্রতিক একগাদা শূন্য যোগ দিয়ে একটা বেশ বড় গোল্লা।

এই উদাহরণগুলো এই জন্যে এসে গেল যে, আসলে কাজ করাটাই সব কথা নয়, কাজটা সঠিক কাজ কি না সেটাও কাউকে দেখতে হবে। ডিসেম্বর মাসে কেউ জীবিত থাকলে সে নভেম্বর বা অক্টোবরেও জীবিত ছিল এর প্রমাণ চাওয়ার সমস্যা শুধু পেনশন অফিসেরই নয়, সব অফিসেরই অল্পবিস্তর রয়েছে।

ওয়ার্ক কালচার

॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থাক। এবার ওয়ার্ক কালচার বিষয়ক কয়েকটি উড়ো কাহিনী বলি।

এ সব গল্প শুনে কেউ কেউ হয়ত বলবেন সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি কতাবার্তা। আমি তাঁদের জানাতে চাই, এ সব গল্প আমি রচনা করিনি, আমি শুধু নতুন পরিবেশন করছি।

প্রথম গল্পটা সত্যিই খুব পুরনো। আমি নিজের নামে এটা একাধিকবার চালিয়েছি। এবারও তাই করি।

আগেরদিন রাত্রিতে গভীর ও দীর্ঘ আড্ডা দিয়ে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠেছি। সে অনেকদিন আগের কথা, প্রায় তিরিশ বছর হবে। আমি তখন কিন্তু গোয়ালার গলি কবিতার সেই দুখীসুখী নায়ক হরিপদর মত সরকারি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি।

সেই সময়ে আমার এক অতি বিপজ্জনক ওপরওলা ছিলেন। তাঁর মত গোলমেলে লোক বিশ্বসংসারে বিরল।

সে যা হোক, সেদিন বেশি বেলায় ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে অফিস যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু আগের রাত্রির অনিদ্রা এবং ক্লান্তির জন্যে খাওয়াদাওয়ার পরে বিছানায় একটু শরীর এলিয়ে দিতেই চোখ বুজে এলো এবং ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা প্রায় দুপুর। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে অফিস অভিমুখে রওনা হলাম। অফিসে পৌঁছে ঢোকার মুখে দেখি আমার সেই গোলমেলে ওপরওলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখোমুখি হতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি এত দেরি?'

আমি আর কি বলব, সত্যি কথাই বললাম, 'স্যার, বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঠিক অফিস আসার মুখে।'

এই কথা শুনে আমার সেই ওপরওলা যৎপরোনাস্তি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি মশায়, আপনি বাড়িতেও ঘুমোন নাকি?'

ইঙ্গিতটি অবশ্যই স্পষ্ট। আমি অফিসেই যথেষ্ট ঘুমোই, আমার আবার বাড়িতে ঘুমোনর প্রয়োজন কি?

এই কাহিনীর সূত্রে অন্য একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

সেও অনেকদিন আগের কথা। তখন আমি মহাকরণে একটি দপ্তরে উপসচিব। আমার এক সহকর্মী, তিনিও উপসচিব, আমার সঙ্গে একই ঘরে বসেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই জনৈক সহায়কের বিষয়ে গজগজ করতেন, আমার কাছে অনুযোগও করতেন।

ওই সহায়কটিকে আমিও হাড়েহাড়ে চিনতাম। অমন অকর্মণ্য, সময় অচেতন, মিথ্যাবাদী সরকারি কর্মচারী সহজলভ্য নয়। আমার ভাগ্য ভাল, সে আমার শাখায় কাজ করত না।

আমার সহকর্মীর ভাগ্যও ভাল। কারণ এর মধ্যেই জানা গেল, ওই কর্মচারীটি অন্যত্র কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাওয়ার আগে সহায়কটি যথারীতি তার অফিসার, মানে আমার উপসচিব বন্ধুটিকে একটা ভাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের জন্যে অনুরোধ জানাল। অগত্যা রাজি না হওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

কিন্তু কি সার্টিফিকেট তিনি দেবেন। কাজকর্ম, উপস্থিতি, আচারব্যবহার কোনটাই জ্ঞানত, ধর্মত ভাল বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত অনেক কাটাকুটি করে মাত্র আড়াই পংক্তির একটা সার্টিফিকেট হয়েছিল, তার মধ্যে কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কথা নেই। তবে ভাল বলা হয়েছে, 'ভাল ঘুমোতে পারে'।

অবশেষে একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিই। সদা তৎপর হলেই ওয়ার্ক কালচার উন্নত করা যায় না।

এটা এক পোস্ট অফিসের ঘটনা। যেমন হয়, কাউন্টারে এক ভদ্রলোক কিছু বলেছেন। তার জবাবে কাউন্টারে কর্মরত কেরানিবাবু বললেন, 'না নেই। প্রায় মাসখানেক নেই।'

এই কথা তৎপর নতুন পোস্টমাস্টার মশায়ের কানে যেতে তিনি ছুটে সেই ভদ্রলোককে বললেন, 'না, নেই কেন? আপনি ওই নয় নম্বর কাউন্টারে যান, ওখানে পাবেন।'

মাস্টারমশাই ভেবেছিলেন বেশ কিছুদিন পোস্টাকার্ডের অভাব যাচ্ছে, এই ভদ্রলোক বোধ হয় পোস্টকার্ডের খোঁজ করছেন।

আসলে তিনি অন্য জায়গার লোক। পোস্টাফিসে টিকিট কিনতে এসে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কি না। তারই জবাবে কেরানিবাবুটি জানান, 'না, চার সপ্তাহ নেই।'

সুতরাং এবার যখন মাস্টারমশায়ের কাছে জানতে পারলেন, নয় নম্বর কাউন্টারে বৃষ্টি আছে, তিনি একটু অবাক হলে কারও কিছু করার নেই।

ওয়ার্ক কালচার

॥ ৩ ॥

ইংরেজি সরস সাহিত্যের গুরুদেব, অবিস্মরণীয় জেরোম কে জেরোম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'থ্রি মেন ইন এ বোট' বইতে লিখেছিলেন,

'আমি কাজ ভালবাসি। কাজ আমাকে আকর্ষণ করে। আমি কাজের কাছে বসে থাকি এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাজের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি ভালবাসি কাজটাকে নিজের কাছে ধরে রাখতে। কাজ ছাড়া হতে আমার হৃদয় ভেঙে যায়।'

রসিকতাটি খুবই উচ্চমানের এবং সে জন্যেই স্পষ্ট। কাজ করতে না চাওয়া লোকের পক্ষেই শুধু এ রকম যুক্তির অবতারণা করা সম্ভব। কাজ করি না কারণ কাজকে ভালবাসি আর তাই কাজ ধরে রাখি।

যে-কোন কাজ ফাঁকি দেওয়া লোক, তিনি যাই হোন না কেন, এ রকম একটি সরস যুক্তির আড়ালে অনায়াসেই আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু তা তিনি নেন না। সাধারণত কাজ পড়ে থাকার জন্যে যে কারণগুলি দেখান হয়, তা হল,

(এক) স্ত্রীর শরীর খারাপ। স্ত্রী নাম্নী ভদ্রমহিলা এ সব ব্যাপারে খুব কাজে আসেন। তিনি হয়ত জানেন না কি সব দুরারোগ্য অসুখে তিনি ভুগছেন, যার জন্যে তাঁর স্বামী অফিসের কাজ ঠিক সময়ে তুলতে পারছেন না।

(আজকাল অবশ্য অফিসের মহিলা কর্মীরা স্বামীর অসুখের সুবাদে একই পদ্ধতিতে কাজ এড়িয়ে যাচ্ছেন।)

(দুই) রাস্তায় যানবাহনের অভাব। সেই জন্য অফিস আসতে দেরি হয়ে যায়। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হয়।

(এই যুক্তিটা অবশ্য আপাতগ্রাহ্য। কিন্তু তাঁকে যদি বলা হয়, আপনি সকাল-সকাল এলে এবং দেরি করে অফিস থেকে বেরোলে ভিড় এড়াতে পারেন, তিনি যা যা বলতে পারেন সেটা অকল্পনীয়।)

(তিন) ছেলে বা মেয়ের পরীক্ষা চলছে। সুতরাং তাঁকে হলে ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে অফিসে আসতে হয়। এসেই বেরিয়ে যান পরীক্ষার্থীর টিফিন দিতে। দ্বিতীয় বেলার পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর অফিসে এসে মিনিট পনেরো থেকে আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে যাত্রা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছেলে বা মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

অবশ্য এ সবের বিপরীতে আমি অন্য একটি গল্প জানি, সেটি খুবই মর্মান্তিক।

কোন এক অফিসে এক দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি গত পনোরো বছর ধরে কাজ করছেন। কখনও অনিয়মিতভাবে অফিসে আসেননি। বিনা অনুমতিতে কামাই করেননি। ঠিকঠাক

দশটার মধ্যে অফিসে এসেছেন। সারাদিন ঘাড় গুঁজে কাজ করেছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটির পরে বাড়ি রওনা হয়েছেন।

একদিন সেই ভদ্রলোক বেলা সাড়ে বারোটায় এসে অফিসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু একি চেহারা তাঁর। মাথা ফাটা, কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চুল উসকো খুসকো। ছেঁড়া জামাকাপড়ে ধুলো মাখামাখি। হাত ছড়ে গিয়েছে। কোনরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এসে অফিস পৌঁছালেন।

তাঁকে দেখে ওপরওলা খেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, এত বেলায় সং সেজে কোথা থেকে এলেন?'

ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমার কোন দোষ নেই স্যার।'

ওপরওলা আবার খেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাহলে আমার দোষ?'

ভদ্রলোক অনুনয় করে বললেন, 'স্যার, আমার কথাটা একবার শুনুন।'

অতঃপর ওপরওলা গম্ভীর হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে থেকে চোখটা নামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার অফিসে আসার জন্যে দৌড়ে মিনিবাসে উঠতে গেছি এমন সময় পেছন থেকে একটা গাড়ি এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে ফুটপাথের ওপরে পড়ে গিয়েছিলাম, মাথাটা ফেটে গেল, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলাম।'

ওপরওলা এতক্ষণে অস্থির হয়ে পড়েছেন, তিনি হুমকি দিলেন, 'কথা সংক্ষিপ্ত করুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বলছি স্যার, আর একটু। রাস্তা থেকে লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ব্যাণ্ডেজ করল, ইঞ্জেকশন দিল। বুঝতেই পারছেন স্যার।'

অবশেষে ওপরওলা বললেন, 'তাই বলে এত দেরি!'

ওয়ার্ক কালচার

॥ ৪ ॥

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কি যেন একটা চাকরির জন্যে অফিসে একটি ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছিল। খুব দুঃখজনক কাজ, যতজনের ইন্টারভিউ নেয়া হবে তার মধ্যে শতকরা দশজনও কাজ পাবে কিনা বলা কঠিন। আবার যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে, তাদের অধিকাংশরই যোগ্যতা সন্দেহজনক।

এরই মধ্যে এক চাকরি প্রার্থীকে পেলাম যার আবেদনপত্রে দেখা গেল, সে লিখেছে এর আগে সে আরও তিন জায়গায় কাজ করেছে।

স্বভাবতই তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এই যে তিন জায়গায় তুমি এর আগে কাজ করেছো লিখেছো দরখাস্তে, তা সে সব জায়গা থেকে তোমাকে কোন সার্টিফিকেট দেয়নি?'

উত্তরে চাকরি প্রার্থী জানাল, 'হ্যাঁ, দিয়েছিল।'

তখন তাকে বলা হল, 'দেখি সার্টিফিকেটগুলো দাও তো।'

সে এবার জানাল, সার্টিফিকেটগুলো নেই, সে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

একথা শুনে আমরা যারা সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম সবাই অবাক হয়ে গেলাম। সে কি কথা!

এর পরে সে যা বলল সে খুবই মর্মান্তিক। তার বক্তব্য হল, সেই সার্টিফিকেটগুলোয় তার সম্পর্কে যা লেখা ছিল তা দেখলে তাকে আর কেউ চাকরি দিত না।

বলাবাহুল্য, আমাদের ওখানেও তার চাকরি হয়নি।

পরিহাসের কথা থাক। এবার একটু কঠিন বাস্তবে আশা যাক।

অফিসগুলোতে অনেকেই কাজ করে না। ঠিকমত অফিসে আসে না। ধুমধাড়াক্কা ছুটি নেয়। দরকারি কাগজপত্র, নথি ফেলে রাখে। কাজ ফেলে আড্ডা দেয়। খেলার মাঠে, সিনেমায় যায়। প্রেম করে।

মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে দেখা যায়, লোকমুখে আলোচনাও শোনা যায়। অমুক অফিসে একজন ডিরেক্টর বা কমিশনার এসেছেন। নাম বজ্রপানি চক্রবর্তী কিংবা কৃতান্ত বাগ। তিনি এসেই অফিসে হুলুস্থূল বাধিয়ে দিয়েছেন। সাংঘাতিক কড়াকড়ি শুরু করেছেন। সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে হবে, সিটে থাকতে হবে, টিফিনের সময় কোন কারণেই আধ ঘন্টার বেশি অফিসের বাইরে বা টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে না।

বেশ একটা কাজ কাজ হইচই পড়ে যায়। কিছু পুরনো নথির ওঠানামা শুরু হয়। ধুলোময়লা, মাকড়শার জালের নিচ থেকে অনেক পুরনো কাগজ বেরিয়ে আসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা কেমন যেন অল্পদিন পরেই থিতিয়ে যায়। আবার

ঢিলেমি, কাজে ফাঁকি শুরু হয় । সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ বড় কর্তাও ইতিমধ্যে যথা নিয়মে বদলি হয়ে যান। আবার যে কে সেই। সেই ভূতাবস্থা।

আসলে কোন একক অফিসে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু করা যায় না। দু-চার দিন বিধি নিয়ম প্রয়োগ করে ভয় দেখিয়ে কিছুটা কাজ হয়ত হয়, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না।

কোথাও কোন অফিসে ঠিকমত কাজ হচ্ছে না। তার মধ্যে একটি অফিস যথাযথ চলবে এ রকম হতে পারে না।

ওয়ার্ক কালচার অনেক বড় ব্যাপার। যে কাজ করবে তার যদি কাজ করার মনোভাব না থাকে, সদিচ্ছা ও দায়িত্ববোধ না থাকে, তা হলে ভয় দেখিয়ে, জোর করে কাজ করান কঠিন।

কলু তার ঘানির বলদের গলায় ঘন্টা বেঁধে দেয়, যাতে তার অসাক্ষাতে বলদ যদি ঘানিতে পাক না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘন্টা বাজা থেমে যেতেই সে বুঝতে পারবে। এক পণ্ডিতমশায় এই দেখে কলুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু তোমার বলদ যদি ঘানিতে পাক না নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা দুলিয়ে ঘন্টা নাড়ে, তা হলে তুমি তো বুঝতে পারবে না যে সে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।'

এ কথা শুনে কলু রেগে গিয়ে পণ্ডিতমশায়কে বলেছিল, 'আমার বলদের অত বুদ্ধি নেই। সে তো আর আপনার পাঠাশালায় পড়েনি।'

ওয়ার্ক কালচারের সমস্যা যাদের নিয়ে তারা সবাই কিন্তু ওই পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালার ছাত্র।

জামাই ঠকানো প্রশ্ন বা হেঁয়ালি

বধূমাতাদের যেমন নানাভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে, যার বিবরণ আমরা নিয়তই খবরের কাগজে দেখি, প্রায় ঠিক তেমনিই জামাতা বাবাজীবনদের নানাভাবে ঠকানো হয়ে থাকে। তাদের এক মেয়ে দেখিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়, সোনার বোতামের বদলে গিল্টি করা বোতাম দেয়া হয়, মোটর সাইকেলের বদলে সাইকেল।

এই তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। তবে জামাই ঠকানো একটা প্রাচীন রীতি কিন্তু সেটা পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে নয়, বুদ্ধির প্রশ্নে।

জিনিসটা শুরু হত সেই বাসরঘর থেকে। হেঁয়ালি প্রশ্ন করে শ্রীমান জামাতাকে নাজেহাল করা হত, তার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করা হত। বাসরঘরের এই সব হেঁয়ালি প্রশ্নের নামই হয়ে গেছে জামাই ঠকানো প্রশ্ন।

এরকম জামাই ঠকানো হেঁয়ালির একটা ভাল উদাহরণ হল এই প্রশ্নটি।

'ইংরেজি কোন্ মাসে আটাশ দিন আছে?'

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তরে যে কেউ বলবে, 'ফেব্রুয়ারি মাসে।' কিন্তু উত্তর ঠিক হল না, ভুল হল। এ কথা ঠিকই যে, ফেব্রুয়ারি মাস আটাশ দিনের মাস। কিন্তু আর সব ত্রিশ, একত্রিশ দিনের মাসেও আটাশ দিন আছে। মোট দু'তিন দিন বেশি হলেও আটাশ দিন তো আছে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত, 'সব মাসেই আটাশ দিন আছে।'

সুকুমার রায়ের রচনায়, 'পথটা কোথায় গেছে?' এই প্রশ্ন করায় একজন খেপে গিয়েছিল। পথ আবার কোথায় যাবে, পথ আবার চলাফেরা করতে পারে নাকি? পথের ওপর দিয়ে লোকেরা এদিক ওদিক যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু পথ নিজে কোথাও যেতে পারে না।

এক সময়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নপত্রে বেশ কয়েকটা অঙ্ক থাকত। এগুলো মোটেই অঙ্ক নয়, নির্ভেজাল হেঁয়ালি।

সব চেয়ে বিখ্যাত উদাহরণটি দেখা যাক।

একটি পুকুরে কচুরিপানা দৈনিক দ্বিগুণ হয়ে যায়। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সেই পুকুরটি উনিশ দিনে অর্ধেক ভরে গেল কচুরিপানায়।

এবার প্রশ্ন হল, এখন পুকুরটি কতদিনে কচুরিপানায় সম্পূর্ণ ভরে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর ভালভাবে জানা না থাকলে এই জবাবটি একটু সাবধানে ভেবে দিতে হবে।

প্রশ্নের প্রথমেই আছে কচুরিপানা বেড়ে প্রত্যেক দিন দ্বিগুণ হয়ে যায়। সুতরাং পুকুর

অর্ধেক ভরে গেলে পরের দিনই সম্পূর্ণ ভরে যাবে, সে উনিশ দিনেই অর্ধেক ভরুক কিংবা উনত্রিশ বা একশো দিনে। তার সঙ্গে কোন ব্যাপার নেই, অর্ধেক ভরার পরের দিনই সম্পূর্ণ ভরে যাবে। উনিশ দিনে অর্ধেক হলে কুড়ি দিনে সম্পূর্ণ হবে।

বহু হেঁয়ালির মধ্যে যেমন চতুরতার ছাপ আছে, বুদ্ধির খেলা আছে তেমনিই অনেকগুলি আবার বোকামিতে ভরা অথবা দুর্বোধ্য।

আমাদের বাল্য বয়সে চিৎপুরে বা বটতলায় ছাপা কিছু কিছু হেঁয়ালির বই পাওয়া যেত। তার মধ্যে কোন কোনটি ছিল রীতিমত অশ্লীল। লেখকের নাম পুরো মনে নেই, তিনি ছিলেন তর্করত্ন কিংবা কাব্যতীর্থ উপাধিধারী। কি করে যে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে পারেন সেটা কল্পনা করা কঠিন।

বেশ কিছু হেঁয়ালি ছিল কবিতায় পয়ারের ছন্দে। শব্দের অর্থের মারপ্যাঁচ। এ রকম একটি আজও মনে আছে।

হরির ওপরে হরি
হরি বসে তায়।
হরিরে হেরিয়া হরি
হরিতে লুকায় ॥

এই কবিতার অর্থ হল, জলের ওপরে পদ্ম, তার ওপরে ব্যাঙ বসে আছে, সাপকে দেখে ব্যাঙ জলে (মতান্তরে সবুজের মধ্যে হরিতে) লুকাল।

মোদ্দা কথা, সাপ ব্যাঙ, জল পদ্ম হরি মানে সবই হয়।

অবশেষে একটি শিশুসুলভ হেঁয়ালি আলোচনা করতে পারি।

একটি বাচ্চা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'গত জন্মদিনে তোমার বয়েস কত ছিল?' সে বলল, 'ছয়'। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আগামী জন্মদিনে তোমার বয়স কত হবে? মেয়েটি বলল, 'আট।'

বলুন তো কি ব্যাপার!

ব্যাপার আর কিছুই নয়, আজ মেয়েটির সাত বছরের জন্মদিন।

পুনশ্চঃ

শেষ হেঁয়ালি

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি কখনও কোন বিষয়েই মিল না হয়, অন্তত একটা ব্যাপারে মিল হবে। সেটা কি?

উত্তর : বিয়ের তারিখ। দু'জনের একই দিনে বিয়ে হয়েছিল।

কঠিন কঠোর গদ্য

এবার পদ্য নয়। এবার কঠিন কঠোর গদ্য। তবে সে ওই পুরনো শনিবারের চিঠি থেকেই। সম্প্রতি পুরনো শনিবারের চিঠির তিনটি সঙ্কলনগ্রন্থ বেরিয়েছে। তার মধ্যে ব্যঙ্গ সঙ্কলন থেকে কঠিন কঠোর গদ্য নিবেদন করছি।

প্রথমেই যে নিবন্ধটি ধরছি, সেটি একটি নির্জলা স্যাটায়ার, তার নামেই চিত্ত চমৎকার, 'পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল ধ্বংস ফতোয়া।' নিবন্ধকার হলেন পিতামহ রামাপদ চট্টোপাধ্যায়, যিনি এ রকম নামের একটি নিবন্ধ রচনা করতে পারেন। তা এখন ভাবাই যায় না।

রচনাটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে, 'আরব দেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফরাসিতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্যে কাফেররা মেদিনা শহরকে বাংলাদেশের মেদিনীপুর মনে করে। পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরব দেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে।'...

অতঃপর অন্য এক পিতামহ পরশুরাম তথা রাজশেখর বসুর রচনার উল্লেখ করতে হয়। রচনার নাম 'তামাক ও বড় তামাক', উনিশশো আটাশ সালের প্রথমে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য 'বড় তামাক' মানে গাঁজা। এই নিবন্ধই পরশুরাম লিখেছিলেন, 'মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, ঘরসংসার পাতে, জীবনধারণের জন্যে যা কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না— সে একটু নেশাও চায়।...

'শরবত খুব স্নিগ্ধ, লুচিমণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিসে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময় অসম্ভব।'...

এই ব্যঙ্গ রচনা সংগ্রহে 'উদৌস্কৃত প্রতারিণী সভা' নামে একটি চমৎকার রচনা রয়েছে। রচনাকার হলধর ভড়। হলধর ভড় অবশ্যই ছদ্মনাম, তবে তাঁর প্রকৃত নাম আমার জানা নেই।

এই ব্যঙ্গ রচনার এক জায়গায় আছে, 'আমার নাম গাজী বিটকেল উদ্দীন। ঢাকা জিলার মক্তব হতে বাংলা বাত improve করবার জন্য কলকাতায় এসেছি।' অন্যত্র একটি কথোপকথনে দেখছি,

...আমাকে দেখিয়াই (মামা) বলিলেন, 'আজ আমার নতুন নামে পাঁচশ' কার্ড ছাপিয়েছি।'

আমি— নতুন নাম কি মামা? নামও বদলালেন নাকি?

মামা— সব বদলাইনি। কেবল ধনপতিবাবুর বদলে দৌলতখসমবাবু করেছি।

(ধন = দৌলত, পতি = খসম।)

আমি— কি সর্বানাশ! করেছেন কি মামা, কেবল বাবুটুকু রেখেছেন? ওটুকুও বাদ দিলেন না কেন?'

মামা— সেদিন রহিমুদ্দীন একখানা বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বিড়ি মুড়ে দিল। বিড়ি বার করতে গিয়ে দেখি কাগজে লেখা রয়েছে 'বুদ্ধদেব বসু প্রণীত।'... বুদ্ধদেবের উপাধি ত্যাগ করলে আমার নেমকহারামি হবে, ভেস্তে (বেহেস্তে) যেতে পারব না।

এ হল একেবারে যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখি। এ রচনা ঊনিশশো বত্রিশ সালের। একদিকে মুসলিম লিগের ঘোরতর দিন, অন্য দিকে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য প্রমুখ কল্লোল যুগের রথীরা। শনিবারের চিঠি একসঙ্গে দু'জনকেই দু'হাত নিল।

অতঃপর কঠিন কঠোর গদ্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দেই। প্রবন্ধটির নাম 'নেতা'। নেতার লেখকের নাম 'বঙ্গচন্দ্র সিদ্ধান্ত' যথারীতি ছদ্মনাম।

নেতারা অংশবিশেষ,

যিনি অনুচরের নিকট হাস্য করিবেন, প্রবলের নিকট ক্রন্দন করিবেন, দুর্বলের নিকট তর্জন করিবেন, পাওনাদারের নিকট গর্জন করিবেন, পরনারীর ইঙ্গিতে নর্তনকুর্দন করিবেন এবং প্ল্যাটফর্ম নামক মঞ্চে আরোহণ করিলে যুগপত সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন করিবেন তিনিই নেতা।....

...'যিনি ভোটারদের ঘুষ দিয়া ভোট সংগ্রহ করিবেন, পতিকে মাহিনা দিয়া সতী সংগ্রহ করিবেন, এবং শরণাগতকে চাপ দিয়া মদ্য ও উপপত্নী সংগ্রহ করিবেন তিনি নেতা।'...

অবশেষে সজনীকান্তকে দিয়েই শেষ করি। রাম-রাবণের কথোপকথন :-

রাবণ : ক্যাপিটালিস্ট গ্রামফেড র‍্যাম, সাবধান, তোমাকে মাটন বানিয়ে চপ করে খাব।

রাম : দূর ই ভুষণ্ডির মাঠের র‍্যাভেন, কা কা করে আর দিক করিস না।

এখানে মনে রাখতে হবে র‍্যাম ও র‍্যাভেন ইংরেজি শব্দ। র‍্যাম মানে ভেড়া আর র‍্যাভেন মানে কাক।

ভূতের পাঁচালি

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরির 'ভূতের পাঁচালি' একটি বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থ। কিন্তু এ জাতের বই বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয়নি। লক্ষ্মীর পাঁচালি বাঙালির ঘরে ঘরে। শনির পাঁচালি বা সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাঠ না করলেও শোনেনি এমন লোক পাওয়া কঠিন।

কিন্তু ভূতের পাঁচালি মাত্র তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। লেখক নিজের উদ্যোগেই প্রকাশ করেছিলেন, ১৩৭১ সালে মানে তিন দশক আগে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণটি আমার কাছে আছে।

ভূতের পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে, একটি উত্তরসহ জিজ্ঞাসা দিয়ে, যা ইচ্ছে বলগে তোরা, ভূত কিন্তু আছে;

প্রমাণ? প্রমাণ চাই?.....

এর পরে পুরো চার-পাঁচ পৃষ্ঠা কৃত্তিবাসী পয়ারে ভূতের অস্তিত্বের কথা বলেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সে এক অসামান্য বর্ণনা।

গ্রামের বাইরে ভাঙা শিবমন্দির, শ্যাওড়ার জঙ্গল। শেয়াল ঝগড়া করে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে। শনিবারের সন্ধ্যা। বেদী বাঁধা বুড়ো বেলগাছ। তা ছাড়া—

'অমাবস্যায় সে রাত্রিতে ছিল নিশ্চয়, নতুবা কি অন্ধকার অত ঘোর হয়।'

এই বর্ণনার শেষে দেখা যাচ্ছে, 'ইয়া বড় মাথা আর হাত একখানি হরে, হরো কি হলরে, ওরে জল আন',

অর্থাৎ ভূতের ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে শ্রোতা নিজেই অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং পর পর পাঁচালিকার নাকমলা, কানমলা খেয়ে বলছেন আর ভূতের প্রসঙ্গে যাবেন না।

কিন্তু ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে সহজে নামবে না। আর নামেই যদি ভূতের নাচ শুরু হয়ে যায়। ভূতের পাঁচালির দ্বিতীয় অধ্যায় হল ভূতের নাচ, ভারতচন্দ্রের কবিতায় ভূতের নাচের অতুলনীয় দৃশ্য আছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অত উচ্চমানের নয়। কিন্তু এখানেও মজা আছে :

'জানলা দুয়ার দুরুম দুরুম
হয়ে গেলো ফাঁক
পিলপিলিয়ে বেরিয়ে এলো
ভূত-পেত্নীর ঝাঁক ;
হাঁই-মাই-চাঁই হাঁউ-মাউ-চাউ,
ফী ফ ফাম,
ধর্-ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্
ওকে ধরে খাম্।'

ভূতের পাঁচালির সব ক'টি রচনার উল্লেখ করা এখানে স্থানাভাবে সম্ভবপর নয়। পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছুঁয়ে যাই।

কবিতার নাম, 'নিশির ডাক'। নিশির ডাক মানে রাতের বেলায় ভূত এসে ডাকছে। 'রাত্রি তখন সাড়ে তিনটে, নিঝুম পাড়াগ্রাম, আকাশ ভরে উপছে পড়ে ঝিঁঝি পোকার গান।' সেই সময়,

'হরসুন্দর বাড়ি আছো?
ঘুমিয়ে আছো নাকি?
মাছ খাবে তো শীগ্রি এসো,
রাত বেশি নেই বাকি।'

এই সঙ্গে মাধুরী চৌধুরির আঁকা চমৎকার ছবি। ভূতেরা হরসুন্দরের বাড়ির সামনে তালতলায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, দেখলে গা ছমছম করে।

এর পরের কবিতাতেও ভূত বাড়ি বয়ে এসে ডাকছে,

'শাউড়ি ঠা'রুন দরজা খুলুন,
আমি বনমালী।'...
...এত রাত্রে কে ডাকরে
ওমা আন্নাকালী?'....

এই কবিতার নাম 'ভূতের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া'। বিষয়, জামাতা মরে ভূত হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে।

ভূতের পাঁচালিতে 'পাড়াগেঁয়ে ভূতের কলিকাতা দর্শন' একটি অতিদীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় মরে ভূত হওয়ার একটি স্পষ্ট ব্যাখান রয়েছে,

'শশধর তর্কচঞ্চু, পত্নী মধুমেলা, ঘোর শাক্ত বাসি পাঁঠা খেয়ে তিন বেলা মা কালীর মহাভোগ, খাস কলেরায় মারা গেলে একসাথে, মরে দু'জনায় একজনা ভূত হলো, পেত্নী একজনা,.....

ভূত হওয়ার পরে শশধর এবং মধুমেলার ইচ্ছে হল কলকাতায় যায়। সেখানে গিয়ে আদি গঙ্গার জলে স্নান করে মা কালীর চরণতলে ঠাঁই নেবে। অবশ্য মধুমেলার আরও একটা বাসনা আছে,

'কোনো এক ভালো সিনেমায় যাব একবার, গিয়ে প্রেমের ফিলিম দেখলে অন্তরভরে;'

জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভূতের পাঁচালি, আশ্চর্য আধুনিক রচনা। ভূত বিষয়ে যে কোন সংস্কার এই পাঁচালি পাঠ করলে দূর হবে ; সে সাহেব ভূতই হোক বা মেছো ভূত, কবি ভূত বা উকিল ভূত।

এককালে সমালোচকেরা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি নাটকের সঙ্কলন ছিল, 'নাট্যাঞ্জলি'। তা ছাড়া তাঁর 'ছায়ালোক' এবং 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর বৈঠক' একদিন রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দুঃখের বিষয় আমরা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ভুলে গেছি। তাঁর বইগুলিও আর পাওয়া যায় না।

সবিনয় নিবেদন

ভারতীয় বার্তাজীবী সংস্থা তাদের বাৎসরিক মুখপত্রে আমাকে লেখা দিতে বলেছেন। ঠিক আমাকে কেন লেখা দিতে বলেছেন সেটা আমার বোধগম্য নয়। আমি তেমন মান্যগণ্য লোক নই। হালকা জনতোষিণী লেখা লিখি, কবিতা লিখি। বুঝতে পারি, এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি রয়েছে।

কিন্তু সাংবাদিকদের মতো অত্যন্ত নাক উঁচু লোক আমি নই। ওঁরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, স্টার সুপারস্টার কাউকেই বেহাত করেন না। তবে আমাকে এই অনুগ্রহ কেন! একথা সত্যি যে, সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় চার দশকের। আমি সাংবাদিক নই, কখনো সাংবাদিকতা করিনি। তবে সংবাদপত্রে লিখে আসছি বহুকাল ধরে। খুব সম্ভব সবরকম সংবাদপত্রের পাঠকপাঠিকা আমার নামের সঙ্গে পরিচিত। তার কারণ আমার রচনার উৎকর্ষতা নয়, আমার রচনার ধারাবাহিকতা। প্রায় প্রতিটি দৈনিকে আমি দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক কলম লিখেছি। এখনো একাধিক দৈনিকে প্রত্যেক সপ্তাহে লিখতে হয়। সে আনন্দবাজার কিংবা বর্তমান, আজকাল কিংবা প্রতিদিন এমনকি উত্তরবঙ্গ সংবাদেও ধারাবাহিকভাবে লেখার সুবাদে পাঠকেরা আমার নামের সঙ্গে পরিচিত। যুগান্তরে যেমন লিখেছি কালান্তরেও লিখেছি। সাপ্তাহিক দেশ, অমৃত, সানন্দা, এমনকি গণশক্তির বিশেষ সংখ্যায় সর্বত্রই আমাকে লিখতে হয়েছে। পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়তে ভালবাসেন তাই সম্পাদকেরা লেখা চেয়ে নেন। প্রকাশকেরা বই করে ছাপেন। এবং সেসব বই বিক্রি হয়।

আত্মপরিচয়ে একথাগুলো আত্মপ্রশংসার পর্যায়ে চলে গেল। আসলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সাংবাদিকতা না করেও বহু বহুকাল আমি সংবাদপত্রের পৃথিবীর লোক। আমার বিখ্যাত বন্ধুদের অনেকেই সংবাদপত্রে কর্মরত। পঁয়ত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করেছি। কিন্তু এখনো অনেকে ভুল করেন, ভাবেন আমি বুঝি কোন খবরের কাগজে আছি।

না, আমি কোন খবরের কাগজে কখনোই ছিলাম না। এমনকি খবরের কাগজের অফিসেও আমি কালেভদ্রে যাই। সেও অতি বিরল ঘটনা। আমি লেখা কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দিই। কিংবা তাঁরা লোক পাঠিয়ে নিয়ে যান। নিজহাতে কোনো লেখা কোনো সম্পাদকের কাছে কিংবা কাগজের দপ্তরে নিয়ে যাই না। এ-বিষয়ে আমার বিশেষ সংকোচ আছে।

উৎসবে ব্যসনে, বিয়ে বাড়িতে, শ্মশান-ঘাটে, সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্তা হয়। কখনো কখনো সান্ধ্য আড্ডাতে তাঁদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলি। আমার গাঁজাখুরি গলার মোটা রসিকতায় তাঁরা খুব একটা বিরক্ত হন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য

এই যে, আমার চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে আমি সংবাদপত্র জগতের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম বৃত্তিগতভাবে। রাজ্য সরকারের তথ্য অধিকর্তার পদে আমি আড়াই বছর কাজ করেছি। এখনো অধিকাংশ সাংবাদিকের পকেটে যে প্রেস কার্ড আছে তাতে আমার হাতের কুৎসিত স্বাক্ষর রয়েছে।

আমি কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, কোনো ব্যাপারে তাঁরা আমাকে জড়াননি। বোধ হয়, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় কিংবা দূরদর্শনের পর্দায় আড়াই বছরে তিন-চারবার আমার নাম বা ছবি দেখা গেছে। আমি তথ্য অধিকর্তা থাকাকালে কলকাতা বিমান বন্দরে বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস মিটিং নিয়ে গোলমেলে ঘটনা ঘটেছিল। সাংবাদিকদের নিষ্কর্মা করে রাখা হয়েছিল। তার চেয়েও বেশি গোলমাল হয়েছিল পরবর্তীকালে মহাকরণে প্রেস কর্ণার ভাঙ্গা নিয়ে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এজাতীয় ঘটনায় তাঁরা আমাকে জড়াননি। যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়ে তাঁরা আমাকে সব দায় থেকে অব্যাহত রেখেছেন।

ভাগ্যের পরিহাসে অবশেষে আমি নিজেই সংবাদপত্রের আঙিনায় চলে এসেছি। প্রতিদিন দুপুরে একটি ভগ্নগবাক্ষ হাড়জিরজিরে প্রাচীন দালানে, প্রাচীনতর একটি প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করছি। ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং শব্দ, লোকজনের ব্যস্ততা. এর মধ্যে যতটা দূরে থাকা যায় ঠিক ততটা দূর থেকে আমি বসে বসে সব দেখি। পারলে দু-চার পংক্তি লিখি।

আমি ভাল আছি।

হোটেল

আগে ধর্মশালা ছিল, ছিল পথের পাশের চটি। এখনও সেগুলো অল্পবিস্তর যে নেই তা নয়, কিন্তু মোটামুটি ধর্মশালার জায়গা দখল করে নিয়েছে হোটেল।

এক সময়ে বড় বড় রেল স্টেশনে ভাল রিটায়ারিং রুম ছিল। সে এখন অতীত কালের ব্যাপার। দুয়েকটি স্টেশনে যদিও বা আছে, সেটি অতি নোংরা। তার ওপরে ছেঁড়া বিছানা, ভাঙা আসবাব সেই সঙ্গে ইঁদুর, আরশোলা বা সাপের উৎপাত। মশা, ছারপোকা তো আছেই। কোথাও কোথাও সমাজবিরোধীদের উপদ্রবও আছে। চুল্লুর ঠেক, যৌনকর্মীর নৈশ ডিউটিতে এ সব জায়গা ব্যবহৃত হয়।

তবে সরকারি ডাকবাংলো আছে, সার্কিট হাউস আছে। তবে বিশেষ ভাগ্যবান না হলে, সরকারি কর্তাব্যক্তি না হলে এ সব স্থানে জায়গা পাওয়া কঠিন।

অগত্যা কোথাও বেড়াতে গেলে, সমুদ্রতীরে অথবা শৈল শহরে, কিংবা তীর্থস্থানে হোটেলেই উঠতে হয়। কিন্তু হোটেল ব্যাপারটা বাঙালির তেমন পছন্দ নয়। যাঁদের একা একা কাজে কর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁরা হোটেলেই ওঠেন কিন্তু সপরিবারে বেড়াতে গেলে গড়পড়তা বাঙালির হোটেল ভাল লাগে না।

তাই ব্যাঙের ছাতার মত ভ্রমণকেন্দ্রগুলিতে গজিয়ে উঠেছে 'হলিডে হোম'। সেখানে সপরিবারে কর্তা গিন্নি গিয়ে ওঠেন। নিজেরা বাজার করেন। হলিডে হোমের বাসন ভাড়া করে দু'বেলা রান্না করে খান। হলিডে হোমের কেয়ারটেকার বা ম্যানেজার আছেন তদারকি করার জন্যে, ঠিকে লোক আছে সাহায্য করার জন্যে। প্রবাসে গৃহসুখ ভোগ করেন ভ্রমণকারীরা।

সুতরাং এবার আমি যে গল্পগুলি বলছি, সে সবই বিলিতি। এর মধ্যে একটিমাত্র দিশি গল্প আছে। সেটাই আগে বলি।

বেশ কয়েক বছর আগে আগ্রা গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম এক সাধারণ হোটেলে। সেটা নভেম্বর মাস, শীত তখনও জাঁকিয়ে পড়েনি, তবুও বেশ ঠাণ্ডা, কলকাতার জানুয়ারি মাসের মত।

আমি আবার একটু শীতকাতুরে। ঠাণ্ডার দিনে একটু গরম জল পেলে ভাল হয়। স্নানটান ঠাণ্ডার দিনে বিশেষ না করলেও, একটু গরম জলে হাত মুখ না ধুলে চলে না।

রেলস্টেশন থেকে রিকশাচালকবেশী যে দালাল আমাকে এই হোটেলে ধরে এনেছিল, সে বারবার বলেছিল, 'ঠাণ্ডা পানি, গরম পানি, নাস্তা।' কিন্তু হোটেলের ঘরে ঢুকে বুঝলাম, ঠকে গেছি। লোকটা ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে।

তখন আর কিছু করবার নেই। তিনদিনের ঘরভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি। সেই রিকশাওয়ালা ঘন্টি বাজিয়ে হোটেল থেকে তার কমিশন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে।

সে যা হোক ট্যাপ খুলে কনকনে ঠাণ্ডা জল আঁজলায় নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গেলাম অভিযোগ জানাতে।

ম্যানেজার সাহেব মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শুনলেন। তারপর বললেন, 'রিকশাওয়ালা ঠিকই বলেছে।'

আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানে? ট্যাপে তো শুধু ঠাণ্ডা জল পেলাম। গরম জল কোথায়?'

একটা পায়রার পালক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এখন তো ঠাণ্ডা জলই পাবেন। এখন গরম জল পাবেন কোথায়? গরম জল চান তো মে মাসের দুপুরবেলায় আসবেন, দেখবেন জল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। স্বয়ং ভগবানজীর ব্যবস্থা এটা। শীতকালে ঠাণ্ডা জল আর গরমের দিনে গরম জল।'

আমার এই দুঃখের গল্প পড়ে কেউ যদি বিচলিত বোধ করে থাকেন পরে গল্পটি তাঁকে আরও বিচলিত করতে পারে, তাই নাট্যাকারে পরিবেশন করছি।

(বিলেতের একটি হোটেলের ম্যানেজারের কাউন্টার, তার সামনে হোটেলের এক অতিথি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে।)

উত্তেজিত অতিথি : এই মাত্র আমার হোটেলের ঘরে একটা ইঁদুর দেখলাম।

নির্বিকার ম্যানেজার : আপনি কত পাউণ্ডের ঘরে রয়েছেন?

উত্তেজিত অতিথি : পঞ্চাশ পাউণ্ড। এ প্রশ্ন কেন?

নির্বিকার ম্যানেজার : সত্যি ইঁদুর দেখেছেন? কত বড় ইঁদুর?

উত্তেজিত অতিথি : ইঁদুর আবার কত বড় হবে? দু' ইঞ্চি, তিনি ইঞ্চি হবে।

নির্বিকার ম্যানেজার : মাফ করবেন। খুব গোলমাল হয়ে গেছে। ইঁদুর তো পঁচিশ পাউণ্ডের ঘরের জন্যে। আপনি পঞ্চাশ পাউণ্ডে আছেন, আপনি তো ছুঁচো পাবেন। আপনি ঘরে যান, চিন্তা করবেন না। আমি, দেখছি কি করা যায়।

এর পরের গল্পটাও বিলিতি, ইংরেজি জোকবুকে পড়েছি। আমি একটু নিজের মত করে সাজিয়ে দার্জিলিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে দার্জিলিংয়ে হোটেলে হোটেলে খুব ভিড়। হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরে এক ভদ্রলোক শেষ হোটেলটিতে এসে বললেন, 'আমাকে থাকার জায়গা দিতেই হবে।'

হোটেলের মালিক বললেন, 'উপায় নেই। এক ফুট জায়গাও খালি নেই।'

তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখুন, এখন আমি না এসে যদি মাধুরী দীক্ষিত আসতেন, তা হলে কি তাঁকে একটা থাকার জায়গা দিতেন না।'

মালিক বললেন, 'তা, মাধুরী দীক্ষিত এলে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করতে হত।'

এবার আগত ভদ্রলোক উল্লসিত হয়ে পড়লেন, 'আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। মাধুরী দীক্ষিত আসছেন না, তাঁর ঘরটা আমাকে দিন।'

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কাব্য

॥ এক ॥

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, 'শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি।'

এই ইংরেজি শতকের প্রথমার্ধের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে শনিবারের চিঠির প্রতাপ ছিল অনস্বীকার্য এবং সেটা মূলত এই পত্রিকার ব্যঙ্গ ও শ্লেষের জন্যে। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই ব্যঙ্গবহুল, শ্লেষাত্মক রচনাগুলির একটা বড় অংশ ছিল পদ্যে রচিত। সাধারণ পয়ার ছন্দের পদ্য নয়, রীতিমত সুললিত ধ্বনিপ্রধান এবং সমিল। কখনও কখনও চমকপ্রদ মিল সেসব কবিতায় বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে।

সজনীকান্ত নিজে ছিলেন কবি ও সুরকার। সে যুগের বহু জনপ্রিয় গানের তিনি রচনাকার। ছন্দে তাঁর হাত ছিল পাকা :-

দেখলে তো ভাই হাসলে আমার
টোল পড়ে কি গালে—
ঈশান কোণে সানক ভাঙা
চাঁদ যে সুধা ঢালে।

সজনীকান্তই ভুলো নামক এক ব্যক্তির কথা লিখেছিলেন। 'সে নিউ ইয়র্ক হইতে কবিতা লিখিবার এক প্যাঁচ শিখিয়া আসিয়াছে। সে যে-কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে দু-চারটি পয়েন্ট কতকগুলি কাগজের টুকরাতে লিখিয়া সেগুলি একটা ঘুরন্ত চাকীর ওপর ফেলিয়া দেয়। খানিকক্ষণ পরে আপনা হইতে একটি আস্ত কবিতা বাহির হইয়া আসে।'

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমার হিড়িকের যুগে শিবরাম চক্রবর্তীর মত লেখক শনিবারের চিঠিতে কবিতা লিখেছিলেন--

...সাইরেন বাজল রে
বাজল আবার!
আবার পড়ল বোমা--
গুদাম সাবাড়।....

বলা বাহুল্য এ কবিতা নিউ ইয়র্কীয় প্যাঁচের ভুলোর পদ্য নয়। তার প্রমাণ, 'বলবো কি হেথা যেই পড়লো বোমা, উড়ে গেলো কত কি যে, তাইতো ও মা।' এই কবিতারই শেষ দিকে আছে—

...বলি কি রকম!
আমারো বোমার মজা
লেগেছে বিষম !

সাইরেন না বাজলে থাকে নাকো ঘুম।....'

উদ্ভট শব্দ সন্ধানে, ছন্দের খেলায় অসামান্য সাবলীলতা ছিল যোগানন্দ দাসের। তাঁর বস্তি কাব্য থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'কাল রাতে মাইফেল হৈল জাহান্নাম
হররাত হৈ হৈ হল্লা,
সরাব চলল জোর বহুত খুব সুরত
আওরাত করলে জটল্লা।....
....চুরচুরে চাচা যেই লাফ দিয়ে আসমানে
ধাইল হৈয়া পাগল বা তাই দেখে ঊষা ছুঁড়ি আঁতকিয়ে তাড়াতাড়ি
এক ছুটে হৈল ভাগলবা।'...

শনিবারের চিঠিতেই বনফুল লিখেছিলেন,

'জুতো মেরে মেরে ছিঁড়ে গেল জুতো
কয়েক জোড়া।
তবু গাধা হয় গাধাই রহিল
হল না ঘোড়া।
কহিল রজক, 'থামুন, দোহাই,
সব গাধা যদি হইবে ঘোড়াই
কে বহিবে তবে মোদের বোঝাই
ভাবুন থোড়া।
কি হবে মালবহ সকল গাধারে
করিয়া ঘোড়া?

শনিবারের চিঠিতেই বনফুলের সেই বিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি 'বেহার আমার মাসীমা আমার' ছাপা হয়েছিল একটি গল্পের মধ্যে, যার প্রথম অনুচ্ছেদ হল—

'বেহার আমার মাসীমা আমার
ধাইমা আমার আমার দেশ
কাহে গো মাইয়া এইসা হালৎ
কাহে গো তো তোরা এমন বেশ।'

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কাব্য

॥ দুই ॥

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কবিতার রণক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি অবশ্যই ছিলেন সজনীকান্ত দাস স্বয়ং। এর পরেই বড় ভূমিকা ছিল বনফুলের।

বনফুল তখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে মধ্য গগনে। ছোট থেকে ছোট, অতিশয় ছোট সব গল্প, স্থাবর-জঙ্গমের মত উপন্যাস, অসামান্য নাটক সমূহ বাঙালি নাকি তাঁর প্রতিভার নব নব চমকে তখন মুগ্ধ। বনফুলের অধিকাংশ ব্যঙ্গ কবিতাই এই সময়ে লেখা এবং এর বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায়।

বনফুলের বিখ্যাত 'শালা' কবিতা শনিবারের চিঠিতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এবং প্রকাশিত হওয়া মাত্র কবিতাটি বহু আলোচিত হয়ে ওঠে। কবিতাটি শুরু হয়েছিল এই ভাবে,

'সামান্য মানুষ নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা, / হে শ্যালক হে স্বভাব শালা। / বঙ্গ দেশে বহুবার বহু বেশে দেখেছি তোমারে / রচিয়াছি তব জয়মালা।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বনফুলের শালা শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা নন, তিনি স্বভাব শালা। এই কবিতার শেষে বলা হয়েছে,

'আত্মবন্ধু পরিজন কাছে গিয়ে দেখি হায় শেষে / শালা—সব শালা। / দিন যায় ক্রমে দেখি শালা সাগরেতে এসে মেশে / দুনিয়ার যত নদী নালা / হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা।'

কবিতাটি খুব উচ্চস্তরের কিংবা সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক সে কথা বলা যাবে না. খুব একটা সুরুচির ছাপ এই পদ্যে নেই কিন্তু সে সময়ে কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য এ কথা সবারই জানা আছে, সুরুচি বা উচ্চমান জনপ্রিয়তার জন্যে এ সব কিছুর বিশেষ দরকার পড়ে না।

সে যা হোক, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বিশেষ পদ্যটি এবং সমসাময়িক আরো কয়েকটি রচনার সূত্রে এই শনিবারের চিঠিতেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

'...জয় শালা শ্রী সজনীকান্ত কী জয়!/জয় শালা শ্রী পরিমল গোস্বামী কী জয়!!/ জয় শালা 'বনফুল কী জয়!!!'...

এ রচনাও খুব উচ্চমানের এ কথা আমি বলতে পারব না। বরং আমরা অন্যত্র যাই।

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ কবিতার সঙ্গে অনেক সময় ছবিও থাকত। সে একবারে সোনায় সোহাগা কিংবা বলা চলে মণি-কাঞ্চন যোগ। সজনীকান্ত দাসের কবিতার সঙ্গে অসামান্য অর্থবহ ছবি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরির। এবং ছবি ও কবিতার সেই আশ্চর্য

সংমিশ্রণ 'ছবিতা'। সজনী দাসের সাজান রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানের লাইন বা কবিতার পংক্তির সঙ্গে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অপ্রাকৃত ছবি।

রবীন্দ্রনাথের সূত্রেই মনে পড়ছে শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠাতে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীও কবিতা লিখেছিলেন, যে কবিতায় ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। এবং কবিতাটির নাম 'বুড়োদের বিয়ে'। কবিতাটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৫ সনে, শান্তিনিকেতনী ব্রাহ্ম আবহাওয়ার বিধিনিষেধ এবং রক্ষণশীলতা তখন বোধহয় বেশ শিথিল হয়ে এসেছে।

অবশ্য এ কথা উল্লেখ না করা অনুচিত হবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও শনিবারের চিঠিতে বহু হাসির কবিতা লিখেছেন। অতুলনীয় সে সব কবিতা বাংলা সাহিত্যের চিরদিনের সম্পদ :

সত্য হোক বা আজগুবি হোক/আদম দিঘির পাড়ে/বাঁদর চড়ে বসে আছে/রামছাগলের ঘাড়ে।

শনিবারের চিঠিতেই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'অবচেতনতার অবদান', তাঁর আঁকা ছবি সমেত। রবীন্দ্রনাথে লিখেছিলেন। 'কলেজ পালায় শেয়াল তাড়ায়/অন্ধ-কলুর গিন্নি।/ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায় সত্যনীরের সিন্নি।

এই কবিতার মুখবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি।... কেই কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।'

দে গরুর গা ধুইয়ে

॥ এক ॥

বাঙালি পাঠক কবি নজরুল ইসলামকে জানেন। তাঁর কবিতা পড়েননি, এমন শিক্ষিত বাঙালি পাওয়া যাবে না। স্কুল-কলেজে সবাইকে তাঁর কবিতা পড়তে হয়েছে, নজরুল ইসলামের অনেক বিখ্যাত কবিতার দু'চার পঙ্‌ক্তি অনেকেরই মুখস্থ। সুবে বাংলার গ্রীষ্মের অপরাহ্নে, পশ্চিমবঙ্গে-বাংলাদেশে এবং অন্যত্র গ্রামেগঞ্জে, শহরে-মফস্বলে নজরুল সন্ধ্যা একটি নিয়মিত বার্ষিক আকর্ষণ। নজরুলগীতি বিচিত্রানুষ্ঠানে, বেতারে দূরদর্শনে এখনও জনপ্রিয়।

কিন্তু গান আর কবিতার বাইরে যে নজরুল ইসলাম, যিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন, ব্যঙ্গ রচনায় যাঁর শাণিত কলম বারংবার ঝলসিয়ে উঠত, সেই গদ্যলেখক নজরুল ইসলামের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের মোটেই পরিচয় নেই।

প্রথমে দু-একটা সরস উদাহরণ দিয়ে নিই, তা হলে আর এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন হবে না।

(এক) 'একজনের একটি ছেলে কথায় কথায় যাকে-তাকে শালা বলত। ছেলেটির বাবার কাছে এই নিয়ে অনেকে মিলে একদিন নালিশ করলে ছেলের বাবা ছেলেকে ডেকে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে খোকা, তুই নাকি আজকাল যাকে-তাকে শালা বলছিস।' ছেলে অনুনাসিক স্বরে বললে, 'না বাবা, কখ্‌খনো না। কোন্ শালা বললে তোমাকে এ কথা?'

(দুই) 'সম্প্রতি পেচক ও চামচিকেদের এক জলসা হয়ে গেছে। এবং তাতে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে যে, তারা আর সূর্য-চন্দ্রের অতি আলোকের কোন প্রয়োজন আছে বলে বোধ করে না। কারণ সে আলোক তারা বরদাস্ত করতে পারে না। এখন থেকে চন্দ্র-সূর্যের পরিবর্তে তাদের জগতে 'চেরাগ-ই-ভুগজুগনি' অর্থাৎ জোনাকি পোকার বাতিই আলো দান করবে।'

ইংরেজি বিশের দশকের শেষভাগে কলকাতা তেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকায় 'চানাচুর' নামে একটি ধারাবাহিক ব্যঙ্গ রচনার কলম লিখতেন নজরুল ইসলাম। সে আজকের কথা নয়, তারপর প্রায় পৌনে এক শতাব্দী হয়ে গেল।

যখন ভাবি যে এই সেদিনও, মাত্র দুয়েক দশক আগেও বাংলা খবরের কাগজে সাধুভাষায় সংবাদ পরিবেশিত হত, যখন কল্লোল পরবর্তী বাংলা সাধারণ গদ্যরচনার কথা স্মরণ করি, তখন নজরুলের এই গদ্যভাষা এখনও যে সম্পূর্ণ আধুনিক. সেটা ভেবে খুবই বিস্ময় বোধ করি।

'চানাচুর'-এ প্রকাশিত প্রায় সমস্ত রচনাই ছিল রাজনৈতিক ব্যঙ্গ মৌলবাদীদের বিপক্ষে।

মুসলিম মৌলবাদীরা নজরুলকে সহ্য করতে পারতেন না, 'কাফের' বলে গালাগাল করতেন। এদের প্রধান মুখপত্র ছিল 'আল মুসলিম' নামে একটি রক্ষণশীল পত্রিকা।

আল মুসলিম প্রকাশিত হয়েই খুব হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রগতিশীল মুসলমান সমাজ এবং তার প্রতীক নজরুল ইসলাম। এদের কুৎসার জবাবে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন ;

...'আমাদের সদ্যপ্রসূত এক কাষ্ঠমোল্লাই সহযোগী ভাল করে দিনের আলো না দেখতেই যে রকম হাত-পা ছোড়া আরম্ভ করেছে, তাতে তার দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। হয় তড়কা না হয় পেঁচোয় পেয়েছে তাকে। মাতৃস্তন্যের অভাবে গাধার দুধ খাওয়ানর জন্যই বুঝি বেচারীর এই দুর্দশা।'...

নজরুলের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য সত্য হয়েছিল। আল মুসলিম বেশিদিন বাঁচেনি। কিন্তু চানাচুর অব্যাহত ছিল।

দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এই সব রচনা কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। আমি নিজেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।

সম্প্রতি আমার হাতে একটি বই এসেছে, 'নজরুলের অপ্রকাশিত ব্যঙ্গ রচনা' নামে। অবশ্য বইটির নামকরণ করা উচিত ছিল, 'নজরুলের অগ্রন্থিত ব্যঙ্গ রচনা।' সে যা হোক, বইটির গ্রন্থকার বাংলাদেশী গবেষক ডঃ সুনীলকান্তি দে। এই বইটি প্রকাশ করে তিনি একটি বড় কাজ করেছেন। কঠোর পরিশ্রমও তাঁকে করতে হয়েছে। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাপ্তাহিক সওগাতে ধারাবাহিক 'চানাচুর' লেখা আরম্ভ করার আগেই দৈনিক মোহাম্মদীতে একটি ব্যঙ্গ রসাত্মক কলম আরম্ভ করেন। সেটা উনিশশো বাইশ সালে কথা।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হল 'দৈনিক মোহাম্মদী' অফিসে। এসেই তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু ব্যঙ্গ রসাত্মক কলমটি লিখব।... নজরুল এ কলমের নামকরণ করলেন 'কাতুকুতু।' প্রতিদিন 'কাতুকুতু' বোরোতে লাগল। দৈনিক মোহাম্মদীর পাঠকদের মুখে হাসির হুল্লোড় উঠল।'

নজরুল অবশ্য মোহাম্মদীতে বেশি দিন টেকেননি। মোহাম্মদী ক্রমশ রক্ষণশীল, গোঁড়াদের হাতে চলে গিয়েছিল। নজরুল ততদিনে সওগাতে চলে এসেছেন। আজ থেকে সাত দশক আগে সওগাত-মোহাম্মদীর কলহ বংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃত অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে আলোকপাত করার যোগ্যতা আমার নেই।

তবে নজরুলের ব্যঙ্গকৌতুক নিয়ে আরও কিছু বলার আছে।

দে গরুর গা ধুইয়ে

॥ দুই ॥

দেশভাগের কিছুকাল পরে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর এক বিখ্যাত ছড়ায় বলেছিলেন, সব কিছু বিলকুল ভাগ হয়ে গেছে, শুধু একটা ভুল হয়ে গেছে, নজরুলকে ভাগ করা হয়নি।

দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। সে দিনের সেই হতভাগ্য ভারতবর্ষে মানুষের মাত্র দু'টি পরিচয় ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। সর্বতোভাবে আপাদমস্তক সেকুলার নজরুল এই ভাগাভাগির মধ্যে পড়েন না, তিনিই তো লিখেছিলেন,

'...বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি
রোল উঠিল, 'হা হন্তন !'
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল
হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা,
মন্দির পানে হিন্দু!
আকাশে উঠিল চিরজিজ্ঞাসা
করুণ চন্দ্রবিন্দু।

কবিতার কথা এখন থাক, এসব কবিতা তো সকলেরই চেনা। বরং নজরুলের ব্যঙ্গ গদ্য থেকে উদাহরণ দিই, যার অধিকাংশই পাঠক সাধারণের অপরিচিত। ১৯২৮ সালে সওগাতের চানাচুরে প্রকাশিত 'জল-পানির' এই খণ্ড আখ্যানটি মর্মান্তিক :-

...এক তৃষ্ণার্ত মুসলমান ফকির হিন্দুর গ্রামে গিয়ে যেখানে 'পানি' চায়, সেইখানে গিয়েই দেখে 'জল'। মুসলমানকে কেউ আর জল দিতে চায় না দেখে সে প্রাণের দায়ে এক বাড়িতে গিয়ে এবার আর 'পানি' নয়, 'জল' চাইলে বাড়ির মেয়েরা মুসলমান সন্দেহ করে তাঁকে জল দিতে অস্বীকার করলে সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লার কিরে মা গো, আমি হেঁদু।'

আজকের কথা নয়, সত্তর বছর আগের এই ব্যঙ্গ রচনা। তখনকার দিনে এ সব কথা লিখতে সাহস লাগত।

সাহসের অভাব ছিল না নজরুল ইসলামের। আমাদের এই নিবন্ধের নামটি নজরুল ইসলামের যে কবিতাটি থেকে ধার নেওয়া হয়েছে, সেই দে গরুর গা ধুইয়ে কবিতার কথাই ধরা যাক।

অবশ্য এটি ঠিক কবিতা নয়, গান। ব্যঙ্গ সঙ্গীত। কোরাসে ফিরে ফিরে গাওয়া হচ্ছে,

'দে গরুর গা ধুইয়ে', আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম অসঙ্গতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন নজরুল। দুঃসাহসী সেই সব প্রসঙ্গ।

'চাটুজ্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত বাড়ি।'...

হয়ত এতদিন পরে মনে হতে পারে, এ রকম বলার মধ্যে সহাসের কি প্রয়োজন, কিন্তু নজরুল লিখলেন এবং তারপরে গেয়ে শোনালেন,

'...ভয়ে মিঞা ছাড়ল টুপি
আঁটলো কষে গোপাল কাছা
হিন্দু সাজে গান্ধীক্যাপে
লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি চাচা।'...

ভুলে গেলে চলবে না, সেটা ছিল মুসলিম লিগ-হিন্দু মহাসভার যুগ, গভীর ধর্মান্ধতার দিন।

নজরুল কিন্তু কাউকে ছাড়েননি। ফলে তাঁকে যথেষ্ট গালমন্দ খেতে হয়েছে তাঁর সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কলমকারদের কাছে, যাঁরা অনেকেই তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। আসলে নজরুল ইসলামের শানিত ব্যঙ্গ এবং ক্ষুরধার রসিকতা উপভোগ করার মত যোগ্যতা তাঁদের ছিল না।

এঁদের সম্পর্কে নজরুলের মন্তব্য ছিল, 'রসজ্ঞান আর ল্যাজ আল্লায় না দিলে টেনে বের করা যায় না।'

এর ফল অবশ্য ভাল হয়নি। বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তিরিশের দশকের শেষ পর্যন্ত নজরুলকে গালাগাল করা গোঁড়া মুসলমান সমাজের নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যার মুখপাত্র ছিল মোহাম্মদী পত্রিকা (মাসিক ও সাপ্তাহিক), মোসলেম দর্পণ, আল মুসলিম ইত্যাদি সাময়িকপত্র।

সবচেয়ে বিষাক্ত ছিল 'ইসলাম দর্শন।'

সেখানে লেখা হয়েছিল, 'হতভাগ্য যুবকটি ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই।'

আরও মারাত্মক, 'নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিক দিগকেও পরাজিত করিয়াছে।'

নজরুল কিন্তু অবিচলিত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে নজরুল তাঁর একটা বিখ্যাত কবিতায় দেশবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন।

তোমদের দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে
জাগেনিক সন্দেহ,
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি
অথবা অন্য কেহ।

নজরুল সম্পর্কেও এতদিন পরে আবার ওই একই কথা বলতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না।

লক্ষ্মণের কার্টুন

॥ এক ॥

লক্ষ্মণের কার্টুন নিয়ে আমি এর আগেও অন্যত্র লিখেছি।

রশ্মিপুরম লক্ষ্মণ নামে সারা দেশে কার্টুনিস্ট হিসাবে বিখ্যাত আমার ধারণায় তিনি বর্তমানে সারা দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী। অবশ্য অনেকে মনে করেন তিনি ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বোত্তম কার্টুনিস্ট।

ইংরেজি ভাষায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাহিত্যিকদের অন্যতম আর কে নারায়ণের ভাই আর কে লক্ষ্মণ প্রধানত রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। তাঁর কার্টুন সঙ্কলন 'আমি যা দেখছি', ইতিপূর্বে বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সে বইগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতের যে-কোন বড় রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বুকস্টলে এই বইগুলো পাওয়া যেত। আমি যখনই কোথাও ট্রেনে যেতাম পকেটে টাকা এবং হাতে সময় থাকলে এক খণ্ড বই প্ল্যাটফর্মের বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছি। এভাবে বোধহয় ছ'টি খণ্ড আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। বইগুলি ছোট আকারের, হাফ ক্রাউন সাইজের, তার ওপরে পেপার ব্যাক ফলে অধিকাংশই হারিয়ে গেছে।

সম্প্রতি বিখ্যাত পেঙ্গুইন বুক কোম্পানি লক্ষ্মণের কার্টুনের দু'টি স্থূলকায় বাছাই সঙ্কলন প্রকাশ করেছে। প্রতিটি খণ্ডেই আড়াইশ -তিনশো করে কার্টুন রয়েছে।

আমি মনে মনে মোট হিসেব করে দেখেছি লক্ষ্মণের সমস্ত কার্টুন নিয়ে যদি লক্ষ্মণসমগ্র বের হয়, তা হলে প্রতি খণ্ডে হাজার পৃষ্ঠা। এই রকম দশ-বার খণ্ড হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যার বিপুলতা নয়, রসসৃষ্টির মৌলিকতা এবং অনন্য সাধারণ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে আর কে লক্ষ্মণ জনপ্রিয়।

রাজনৈতিক ব্যাপারে পরে আসছি। একটি সাদাসিধে সরাসরি হাসির ছবিতে যাই।

একটি স্কুটারে করে একটি পরিবার যাচ্ছে। সিটে সামনে-পেছনে স্বামী স্ত্রী আর তাদের কোলে কাঁখে পিঠে পাঁচটি বাচ্চা।

শহরের রাজপথে এ রকম বা এর কাছাকাছি দৃশ্য আমরা তো প্রতিনিয়তই দেখি, কিন্তু সুরসিক লক্ষ্মণের ক্যাপশনটি প্রণিধানযোগ্য।

'যদি পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নাই হয়, তা হলে অন্তত স্কুটারের সাইজটা বড় করতে হবে।'

এর পরে যে ছবিটির উল্লেখ করছি তার বিষয়বস্তু মর্মান্তিক। ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে, রিভলবার উঁচিয়ে তারা ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। ক্যাশিয়ারের সামনে

শূন্য লোহার আলমারি, সিন্দুক হাটখোলা। কাউন্টারের ওপর সেদিনের খবরের কাগজ, যার হেডলাইন হল,

'পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা তছরূপ করে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পলাতক।'

এই পরিস্থিতিতে ক্যাশিয়ারবাবু ডাকাতদের ধমকাচ্ছেন, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ নাকি যে এই ব্যাঙ্ক বেছে নিয়েছেন? আজকের সকালের খবরের কাগজ পড়েননি।'

সত্যিই এই সব আহাম্মক ব্যাঙ্ক ডাকাতদের নিয়ে কি করা যায়। আমদের কিছু করার নেই, কিন্তু লক্ষ্মণ এ রকম ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি সাবলীল।

সমধর্মী অন্য একটা কার্টুন বিবেচনা করা যেতে পারে।

গৃহস্বামীর জবানবন্দী নিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক। ঘরের চারদিকে ভাঙা-চোরা, ছড়ান-ছিটান, উথাল-পাতাল অবস্থা। গৃহস্বামী বিমর্ষমুখে জানাচ্ছেন, 'না, স্যার। হামলাকারীরা কিছুই নিতে পারেনি, কিছুই পায়নি। হামলার একটু আগেই সি বি আইয়ের লোকেরা এসেছিল, গয়নাগাঁটি, টাকা পয়সা যা কিছু ছিল তারাই সব নিয়ে গেছে।'

এবার একটি রাজনৈতিক কার্টুনের কথা বলা যেতে পারে।

দৃশ্য, মন্ত্রীর ঘর। সেখানে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সামনে মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। ঘরের সামনের পেছনের দু'দিকের দরজাই সম্পূর্ণ খোলা।

আগত ভদ্রলোককে মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলছেন, 'আর মাত্র এক সেকেণ্ড আগে এলেই ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হত।

মন্ত্রীমশায় একটু আগে একটা ট্যুর সেরে ওই পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে এসেছেন। আর তারপর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই সামনের দরজা দিয়ে আরেকটা ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন।'

কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট সেক্রেটারির ডান ও বাঁ হাত দু'দিকের খোলা দরজার দিকে প্রসারিত আর তাঁর সামনে নবাগত ভদ্রলোক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

পুনশ্চঃ

আরেকটি অসামান্য ব্যঙ্গচিত্র।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে দূরদর্শনে। দূরদর্শন ফলাও করে প্রচার করছে, মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তাঁকে যেন দূরদর্শনের পর্দায় এত দেখান না হয়।

লক্ষ্মণের কার্টুন

॥ দুই ॥

আর কে লক্ষ্মণের ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে আর কিছু বলার আগে তাঁর পরিচয় আরেকটু দেওয়া দরকার।

রশ্মিপুরম লক্ষ্মণ মহীশূরের লোক। সেখানেই জন্মেছেন এবং লেখাপড়া করেছেন। কলেজে থাকতেই কার্টুন আঁকা আরম্ভ করেন। বোম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নালে হাতেখড়ি। ব্যঙ্গচিত্র ছাড়াও অজস্র গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা লিখেছেন, লিখেছেন জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনী। বোম্বাইয়ের টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়াতে গত চার দশকের বেশি এক নাগাড়ে কাজ করছেন। বয়েস বেশ কিছুদিন হল ষাটের কোঠা পেরিয়ে সত্তরের দিকে।

দেশে-বিদেশে বিপুল প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মণের। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করেছে। মারাঠা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি লিট্ দিয়েছেন। আর কে লক্ষ্মণ ১৯৮৪ সালে রামন ম্যাগসেসাই পুরস্কার পান।

লক্ষ্মণের ব্যঙ্গচিত্রের প্রধান মাহাত্ম্য একটি গৌণ চরিত্র। তিনি কোথাও নেই, কিন্তু সর্বত্রই আছেন। কালো চেক্ চেক্ কোট গায়ে ধুতি পরা এক ক্ষীণকায় সাধারণ মানুষ, লক্ষ্মণের 'কমনম্যান' তাঁর প্রতিটি ব্যঙ্গচিত্রে উপস্থিত রয়েছেন। টাক মাথা, লম্বা নাক, চশমা চোখে এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রতিটি দৃশ্যে অবান্তর হলেও অতি বাস্তব।

কমনম্যান দুর্ভিক্ষে, উৎসবে, সভায়-সমিতিতে, খরায়, বন্যায় সর্বত্র সাবলীলভাবে উপস্থিত। তাঁকে দেখা যায় মিছিলে, সভায়, বাজারে দোকানে, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে, বিমানবন্দরে, রাষ্ট্রীয় ভোজসভায়, মন্ত্রীর সংবর্ধনায় সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি। এক কথায় যেখানে লক্ষ্মণের কার্টুন সেখানেই তিনি। তিনি কমনম্যান, আছেন কিন্তু থেকেও নেই। পাঠকের মুখের অভিব্যক্তিই ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

মন্ত্রীর ঘরের বাইরে জোর আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীরা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দরজার ওদিকে দাঁড়িয়ে। মন্ত্রীর সচিব ওদের সঙ্গে কথা বলে এসে মন্ত্রীকে বলছেন, 'স্যার, ওদের দাবি মোটামুটি ন্যায্য। ওরা বলছে যে, ওরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না, তবে আধা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, যেমন গোটাদুয়েক বাস পোড়ান, দুয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি, দোকানপাট ভাঙা এর মধ্যেই ওরা ওদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবে।'

এই দৃশ্যেরই এক পাশে রয়েছেন। 'কমনম্যান', তাঁর হাতে একটা নথি, তিনি এখানকার কেরানী টেরানী কিছু হবেন। কমনম্যান বিহ্বলভাবে সচিবের কথা শুনছেন।

এ হল লক্ষ্মণের ব্যঙ্গচিত্র, যার মধ্যে ওই কমনম্যান আছেন, কিন্তু থেকেও নেই। তাঁর কিছু করণীয় নেই, তাঁর ভূমিকা দর্শক বা শ্রোতার।

কমনম্যানের প্রসঙ্গ থেকে মূল ব্যঙ্গচিত্রে ফির যাই। অসুবিধে হয়েছে, সেই যে কথা আছে না, বাঁশবনে ডোম কানা। হাতের সামনে দুই খণ্ডে পাঁচশো কার্টুনের মধ্যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বলি এই স্বল্প পরিসরে।

একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে ধর্মঘটীরা পথে বসে আছেন। তাঁদের প্ল্যাকার্ডে দেখা যাচ্ছে তাঁরা শতকরা কুড়ি টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছেন।

ধর্মঘটীদের খোঁচাখোঁচা দাড়ি এবং ময়লা, অবিন্যস্ত জামাকাপড় দেখে অনুমান করা যাচ্ছে যে, তাঁরা অনেকদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন ধর্মঘটীর হাতে একটা খবরের কাগজ। তিনি পাশের জনকে বলছেন, 'আমাদের আরও বেতন বৃদ্ধির দাবি করা উচিত। আমাদের আন্দোলন আরম্ভ করার পরে এর মধ্যে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে গেছে।

আরেকটি অসাধারণ ব্যঙ্গচিত্রের উল্লেখ করি।

একটি অফিসের টেবিলে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে দু'জন বসে। একজন তরুণ, অন্যজন পোড়-খাওয়া প্রৌঢ়। অফিসের ম্যানেজার, অফিস কর্তাকে বোঝাচ্ছেন, 'স্যার আপনি তরুণ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর কথা বলেছিলেন। সেরকম পাওয়া যায়নি। তাই একজন তরুণ কর্মচারী এবং একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী এই দু'জন কর্মচারীকে নিযুক্ত করতে হয়েছে।'

অর্থমন্ত্রী লক্ষ্মণের খুব প্রিয় চরিত্র।

একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ডেপুটেশন এসেছে।

মন্ত্রী মহোদয় তাঁদের কিছু বলতে দিচ্ছেন না। তিনি নিজেই শুধু বলে যাচ্ছেন। ডেপুটেশনকারীদের একজন তখন আরেকজনকে বলছেন, 'এতো মহা আপদ হল দেখছি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের জোরাল, দামী দামী কথাগুলো সব নিজেই বলে যাচ্ছেন, আমাদের কিছুই বলতে দিচ্ছেন না।' অবশেষে আর কে লক্ষ্মণের একটি আপ্তবাক্য দিয়ে শেষ করি।

অর্থমন্ত্রীকে অর্থসচিব বলছেন, 'ঘাটতি বাজেট নিয়ে মাথা ঘামাবেন না স্যার। আমাদের দেশে কোটি কোটি লোক প্রতিটি দিন ঘাটতি বাজেট নিয়ে কাটায়।'

রাজনীতি

আর কে লক্ষ্মণের কার্টুন নিয়ে পরপর দু'বার লেখার পর স্বভাবতই আমরা রাজনীতির বিপজ্জনক পৃথিবীতে প্রবেশ করে গেছি।

এবং বিপদে যখন পড়েইছি তা হলে সে ভালভাবেই পড়া যাক।

এক সান্ধ্য দৈনিকের সম্পাদক গভীর রাতে ফোনের শব্দে জেগে উঠে ও প্রান্তে এক জবরদস্ত রাজনৈতিক নেতার গলা শুনতে পেলেন। সেই নেতা রাগে টগবগ করে ফুটছেন, প্রায় ধমকের স্বরে সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাগজে নাকি আজ সন্ধ্যায় লেখা হয়েছে যে, আমি জোচ্চোর, মদ্যপ, লম্পট। আপনার এত বড়...'

প্রৌঢ়, বিচক্ষণ এবং অদ্যাবধি সাত ঘাটের জল খাওয়া সম্পাদক অনুত্তেজিত, অতি ঠাণ্ডা গলায় রাজনৈতিক নেতা সাহেবকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'দেখুন আপনার নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। আর কেউ ছেপে থাকতে পারে, আমরা এ সংবাদ ছাপিনি। পুরনো, বাসি হয়ে যাওয়া খবর, আমরা ছাপি না।'

এই গল্পটিরই একটি রকমফের আছে। সেটি আরও গোলমেলে।

পাটনার এক সংবাদপত্রের দপ্তরে এক কুখ্যাত মাফিয়া-কাম রাজনৈতিক নেতা সদলবলে প্রবেশ করে সম্পাদকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'এত সব মিথ্যা কথা আমার সম্বন্ধে দিনের পর দিন আপনারা ছাপছেন কোন্ সাহসে?'

অশীতিপর প্রাচীন ব্রাহ্মণ সম্পাদক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলেছিলেন, 'আরে ব্যাটা, তোমার নামে মিথ্যা সংবাদ ছাপা হয়েছে তাই রক্ষে পেয়েছ, সত্যি খবর ছাপা হলে তখন ঘোর বিপদে পড়বে। যাও, এখন যাও, কাজের সময় বিরক্ত করো না।'

রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা নিয়ে বহু রকম গল্প শোনা যায়, তার মধ্যে দু-একটি তো অসামান্য।

প্রথমে একটি সাদাসিধে গল্পের কথা বলি।

এক ভদ্রলোক এক জনসভায় বেশ দেরি করে এসেছেন। তিনি যখন প্রবেশ করেছেন তখন পুরোদমে বক্তৃতা চলছে। তিনি ময়দানের ঘাসের ওপরে একটা রুমাল বিছিয়ে বসে বিখ্যাত বক্তাকে একবার নিরীক্ষণ করে পাশের শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কতক্ষণ বক্তৃতা করছেন?'

আগের শ্রোতা বললেন, 'প্রায় এক ঘন্টা'

সদ্য আগত ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'কি বিষয়ে বলছেন?'

আগের শ্রোতা বললেন, 'তা এখনও কিছু বলেননি।'

অধিকাংশ রাজনীতি বিষয়ক রসিকতার উৎস ইংল্যাণ্ডে। বিলিতি জোকবুকের বৃহদংশই

হল পলিটিক্যাল জোক। তবে এই রসিকতাগুলো তেমন জমকালো নয়, এর মধ্যে একটু শুকনো ভাব আছে, প্রায় সব বিলিতি জোকেরই সেটা একটা আনুষঙ্গিক ত্রুটি।

সে যা হোক, এ জাতীয় একটি বিলিতি গল্প বিবেচনা করা যেতে পারে।

পার্লামেন্টের নির্বাচন সামনে, প্রার্থী তাঁর ভোটকেন্দ্রে গেছেন, সেখানে সভায় বক্তৃতা করছেন। নানা কথার মধ্যে প্রার্থী খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে জোর দিলেন, গমের চাষে গুরুত্ব দিয়ে বললেন, 'গম উৎপাদন বাড়াতে হবে।'

সভার পেছন দিক থেকে বিরুদ্ধ পক্ষীয় এক ব্যক্তি বক্তাকে হেনস্থা করার জন্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'খড়ের কি হবে? খড়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে না?'

বক্তা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'এখন আমরা আমাদের খাদ্যের কথা বলছি। আপনার খাদ্যের বিষয়ে একটু পরে বলছি।'

অতঃপর শেষ গল্পটি বলি। এটি একটি মারাত্মক গল্প।

এক জননেতা পাগলাগারদ পর্যবেক্ষণ করতে গেছেন। জননেতাদের যা স্বভাব তিনি এখানেও বক্তৃতা করতে গেলেন।

তবে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সে রকম কিছু হল না। পাগলরা রীতিমত মনোযোগ দিয়ে শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনলো। যেমন, সাধারণ মানুষজনের ক্ষেত্রে হয়। এমন কি স্থানে-অস্থানে জোরে জোরে হাততালি দিয়ে বক্তামহোদয়কে উৎসাহিত করল।

এমন সময় বক্তা লক্ষ্য করলেন, সভার এক পাশে এক ব্যক্তি একটু আলাদা হয়ে, নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাততালি দিচ্ছে না, বক্তৃতাও শুনছে বলে মনে হচ্ছে না।

বক্তৃতা থামিয়ে নেতামহোদয় সেই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বক্তৃতা শুনছেন না, এদের সঙ্গে হাততালিও দিচ্ছেন না, কেন?'

লোকটি অম্লানবদনে জবাব দিল, 'আমি পাগল নই। আমি এই পাগলাগারদের একজন কর্মচারী।'

আবার রাজনীতি

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর শখের পৌত্রকে কোলে করে বাড়ির বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন। পৌত্রটির বয়েস নয় দশ মাস, সদ্য অন্নপ্রাশন হয়ে গেছে।

নাতিটির মুখে সদ্য তুমি ফুটেছে। সে কলকল করে কথা বলে যাচ্ছে, 'আ-আ, জি-জী, হ-হ'। সে তারস্বরে বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এক অতিথি এসেছেন। তিনি নাতিটিকে দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনার নাতিটি তো বেশ সাব্যস্ত হয়েছে।'

পিতামহ এই কথায় খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'জানেন আমার এই নাতিটি বড় হলে পলিটিশিয়ান হবে।'

আগত ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে বুঝলেন?'

পিতামহ বললেন, 'দেখছেন না, ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। কোন কথার কোন মানে নেই, শুধু বলে যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে।'

এরই পাশাপাশি পরের গল্পটিও স্মরণীয়।

এক জননেতা গেছেন একটি বিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে। তিনি বলে চলেছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রথম দিকে ছেলেরা কেমন ম্রিয়মাণ হয়েছিল কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মাথায় তারা খুব চনমনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটি কি?

বক্তৃতা একটু থামিয়ে তিনি সামনের এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের হঠাৎ হাসিখুশি দেখছি যে?'

ছেলেটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, আপনি আর একটু বক্তৃতা করে গেলেই আমাদের অঙ্কের ক্লাসটা হবে না। অঙ্কের স্যার যা কড়া।'

এই দুটো হালকা গল্পের পরে এবার বোধ হয় আসল গল্পটা বলা যায়।

গল্পটা পুরানো। নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। কিন্তু দ্রব্যগুণে এখনও পরিবেশনযোগ্য।

এই মরপৃথিবীর কোথাও তিন ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন উকিল, একজন পুলিশ আরেকজন রাজনীতিবিদ।

কথায় কথায় তাঁদের আলোচনা এসে পৌঁছাল নিজেদের জীবিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠল কার পেশা সবচেয়ে পুরানো।

তিনজনেই সমান আত্মবিশ্বাসী এবং অহঙ্কারী।

উকিলবাবু বললেন, 'সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষে মানুষে বাদ বিসম্বাদ, গোলমাল। সেই থেকে মামলা, মোকদ্দমা, আর ওই মামলা মোকদ্দমা মানেই আমি, আমি আছি সেই গোড়া থেকে, যেদিন থেকে মানুষে মানুষে গোলমাল শুরু হয়েছে।'

একথা শুনে পুলিশসাহেব বললেন 'কিন্তু গোলমাল বাধলে আমাকে তো লাগবেই। মামলা মোকাদ্দমার ঢের আগে উকিলবাবু প্রবেশ করার আগে আমি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে যেখানেই গোলমাল বাধে, সেখানেই পুলিশ মানে আমি।'

রাজনীতিবিদ এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন, এবার মোক্ষম প্রশ্নটি করলেন, 'কিন্তু গোলমালটা বাধায় কে? আমি বাধাই। তারপর তো আপনারা আসেন।'

নির্বাচন উপলক্ষে এক প্রার্থী ভোটদাতাদের দরজায় দরজায় ভোট ভিক্ষা করে চলেছেন।

প্রায় সব ভোটদাতাই নির্বাক। কেউ মুখে কিছু বলছেন না। শুধু এক ভদ্রলোক বললেন, 'সরি, আপনার দেরি হয়ে গেছে, আমি আপনার আগেই বিপক্ষ প্রার্থীকে কথা দিয়েছি।'

একথা শুনে ঝানু রাজনৈতিক নেতা বললেন, 'কথা দিয়েছেন তাতে কি হয়েছে। জানেন রাজনীতিতে কথা আর কাজ সব সময়ে এক হয় না।'

এই আপ্তবাক্য শুনে বুদ্ধিমান ভোটদাতা বললেন, 'তা হলে তো ঠিকই আছে। আপনাকে কথা দিলাম, ভোটটা ওঁকে দেব।'

সব ক্ষেত্রে অবশ্য এ রকম হয় না। ভোটের ব্যাপারই আলাদা।

ভোটের আগের রাতে ক্লাবে কথা হচ্ছিল। কে কাকে ভোট দেবে? কে কাউকেই ভোট দেবে না, ভোটের দিন বাসায় চুপচাপ বসে তাস খেলবে। কোন্ প্রার্থী কতটা ভাল, কোন্ প্রার্থী কতটা খারাপ। ভোটের আগে এই ধরনের আড্ডায় যেমন আলোচনা হয় তাই হচ্ছিল আর কি।

এরই মধ্যে আগাগোড়া সুবুদ্ধিবাবু বলে যাচ্ছে, 'ভোট ছেলেখেলা নয়। জীবন মরণের মতই গুরুত্বপূর্ণ।'

এবং এর পরেই সুবুদ্ধিবাবু বেশ জোর গলায় বলছেন, 'আমি মশায় কোন দলে নেই। আমার কোন রাজনীতি নেই। যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থী তাকেই আমি ভোট দেব।'

এতক্ষণ কূটবুদ্ধিবাবু টেবিলের একপাশে চুপচাপ বসে চুরুট টানছিলেন। সুবুদ্ধিবাবু চুপ করে যাওয়ার পরে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ভোটের ফলাফল বেরুনোর আগে কে সর্বশ্রেষ্ঠ কি করে বুঝবেন?

ভারতীয় কার্টুন

বইটি আমি আগেই দেখেছিলাম কলকাতা বইমেলায়। হিন্দুস্থান টাইমসের, বুক অফ বেস্ট ইন্ডিয়ান কার্টুনস (Book of Best Indian Cartoons)। মাত্র চৌষট্টি পৃষ্ঠার পেপার ব্যাক বই, দাম চল্লিশ টাকা। দাম দেখে পিছিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আর কেনা হয়নি।

সম্প্রতি আকাদেমিতে বুক-বাজারে বাইটা পেয়ে গেলাম। দাম মাত্র পনের টাকা। আমার মনমত দাম। এবার কিনে ফেললাম।

বাড়িতে ফিরে এসে অবশ্য বইটার পাতা উল্টিয়ে দেখে কেমন বোকা বনে গেলাম, ডাহা ঠকেছি। বইয়ের নাম দেখে মনে হয়েছিল বইটা শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কার্টুনের একটি সঙ্কলন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে আবু আছে, সুধীর দার আছে, লক্ষ্মণ আছে, কুট্টি আছে। পুরনো আমলের কার্টুন থাকলে আমাদের কাফি খাঁ কিংবা শৈল চক্রবর্তীও থাকতে পারে।

কিন্তু মোটেই তা নয়। বইটার মধ্যে একটা জোচ্চুরি আছে। হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকা শৌখিন কার্টুনিস্টদের একটি কার্টুন প্রতিযোগিতা করে। শিক্ষানবিশ ব্যঙ্গচিত্রীরা তাতে যোগদান করেন। তারই বাছাই করা সঙ্কলন এই বই।

বইটির ভূমিকায় বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আবু আব্রাহাম অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। জন কীটস্, ঝাঁ ককতো থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হয়নি। কার্টুন মূলত পরিণত বয়সের, পরিপক্ক বুদ্ধির ফসল, নবাগতদের দিয়ে আর যাই হোক বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহী ব্যঙ্গচিত্র হওয়া কঠিন।

তবুও যেহেতু ছবিগুলো এসেছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার সূত্রে এবং সেই প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক হিন্দুস্থান টাইমসের মত একটি বিখ্যাত পত্রিকা প্রতিষ্ঠান---আমরা না হয় কয়েক মিনিট ব্যয় করে একটু পাতা উল্টিয়ে কার্টুনগুলো দেখি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত পাঁচ বছরের প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ফসল এই ব্যঙ্গচিত্রগুলি, চট করে অবহেলা করাও যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতাগুলিতে অন্যদের মধ্যে বিচারক ছিলেন, ছবিগুলি বাছাই করেছিলেন বিখ্যাত সুন্দরীরা যথা শর্মিলা ঠাকুর, জয়া বচ্চন এবং দীপ্তি নাভাল।

এবার দেখা যাক সুন্দরীরা কি ছবি বেছেছিলেন। কি ধরনের ব্যঙ্গ তাঁদের রুচিসম্মত।

প্রথমেই একটা আপত্তি জানিয়ে রাখি।

এই বইয়ের অধিকাংশ মানে প্রায় সবই, বলা যেতে পারে শতকরা নব্বইটি রাজনৈতিক কার্টুন। সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি খুব কম। এই বইয়ের নাম বেস্ট কার্টুনস না দিয়ে বেস্ট পলিটিকাল কার্টুনস হওয়া উচিত ছিল।

সে যা হোক। এটা হল ফিফটি-ফিফটি, পঞ্চাশ-পঞ্চাশের যুগ। প্রথমে একটা আধা-রাজনৈতিক ছবির কথা বলি।

এটি একটি অসাধারণ ব্যঙ্গচিত্র। ১৯৯১ সালে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় স্থান কেন? প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানের ছবিগুলো দেখলাম, তেমন আহামরি নয়।

এই ছবিটি সম্পর্কে আমার দুর্বলতা কিন্তু আরও একটি কারণে। ছবিটির শিল্পী হলেন এই উত্তরবঙ্গেরই জলপাইগুড়ি শহরের শ্রীযুক্ত নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

কম কথা নয়। সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে, দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং পুরস্কার পাওয়া। জানি না নীলাদ্রিবাবু এখনও জলপাইগুড়িতে আছেন কি না। তাঁকে আমাদের বিলম্বিত, বহু বিলম্বিত অভিনন্দন।

অতঃপর নীলাদ্রিবাবুর ব্যঙ্গচিত্রটার কথা অল্প করে বলি,

একটি সেন্ট্রাল জেলের সামনের ফটক খোলা। তার ভেতর থেকে কোট-প্যান্ট, ভাল জামা-কাপড় পরা লোক দলে দলে বেরিয়ে আসছে। এরা দেখতে মোটেই চোর-ডাকাত বা সাধারণ কয়েদীর মত নয়, রীতিমত ভদ্রলোক সব। জেলগেটের পাশে একজন শান্ত্রী বলছে, 'সবাই কিডন্যাপ হওয়ার ভয়ে জেলে থাকছে।'

পশ্চিমবঙ্গে ভালভাবে বোঝা না গেলেও কিডন্যাপিং প্রায় কুটিরশিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এমন কি খাস দিল্লিতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নীলাদ্রিবাবুর ব্যঙ্গচিত্রটি স্মরণীয়।

অন্য ছবিগুলির মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তরুণ ব্যঙ্গচিত্রীদের যন্ত্রের ব্যাপারে একটা শ্লেষাত্মক মনোভাব আছে।

বিশাখাপত্তনমের নীল জনসন একটি যন্ত্রের ছবি এঁকেছেন। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জনতাকে যন্ত্রবিদ্ বলছেন, 'এই যন্ত্রের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একবিংশ শতকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর তাঁকে ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়।'

আরেকটি ব্যঙ্গচিত্রও যন্ত্র এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়ে। যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনীয়াররা বলাবলি করছেন, 'পুরো নির্বাচনটা কম্পিউটার মারফত করা হল। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রীকে কি করে বোঝাই যে ভোলটেজ ওঠা-নামা করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী হেরে গেছেন।'

বেশ কয়েকটি মজার কার্টুন রয়েছে। যেমন একটিতে এক ব্যক্তি একটি পেটফোলা মশাকে ব্লাড ব্যাঙ্কে নিয়ে গেছেন রক্ত দেওয়ার জন্যে। এবং অপরটিতে 'ডগ শো'-এর (Dog Show)। বাইরে লেখা আছে 'কুকুর হতে সাবধান' (Beware of dogs)।

কিন্তু আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্টুন এইটি :

দু'জন পথের ভিখিরি সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফুটপাতে পাশাপাশি বসে আলাপ করছে। প্রথম ভিখারি, 'মদ ও মহিলাই আমার বর্তমান অবস্থার কারণ।' দ্বিতীয় ভিখারি, 'সততাই আমার বর্তমান অবস্থার কারণ।'

পুনশ্চ কার্টুন

পূর্ব নিবন্ধে 'ইণ্ডিয়ান কার্টুনস' বইয়ের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্রের কথা বলা হয়নি।

যেমন ধারা যাক, এই বইয়ে একটি কার্টুনে দেখা যাচ্ছে গভীর রাতে প্রস্তর বেদি থেকে নির্জন প্রান্তরে নেমে দ্রুত পদে মহাত্মা গান্ধী পালিয়ে যাচ্ছেন। পলায়নের কারণ যাই হোক পলায়নপর গান্ধীমূর্তির মধ্যে এমন একটা বিপন্ন ভাব রয়েছে যেটা অনেকদিন মনে থাকার মত।

আর এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, স্মরণীয় হওয়ার মধ্যেই রয়েছে যে কোন শিল্পকর্মের মতই কার্টুনের সাফল্য। এই ছবিটির কার্টুনিস্ট হলেন রুরকির শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎকুমার দে।

ঠিক এর পরের পাতাতেই একটি করুণ ছবি রয়েছে। মাদ্রাজ শহরের জয়দেববাবুর আঁকা।

প্রচণ্ড খরায় দেশে গাছপালা সব শুকিয়ে গেছে। মাটি ফেটে চৌচির। এমনকি টিউব ওয়েলেও জল উঠছে না।

এই সময় একদিন ক্ষীণ ধারায় বৃষ্টি এল। তৃষ্ণার্ত বিশ্ব প্রকৃতি, মাটি, গাছপালা সেই বারিধারা শুষে নিচ্ছে। এবং এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শুষ্ক নলকূপটিও মুখ দিয়ে জিব বার করে জল গ্রহণ করছে। বলা বাহুল্য এটি একটি অতিশয় মর্মান্তিক ছবি।

ইণ্ডিয়ান কার্টুনস বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রী আবু আব্রাহাম, যিনি আবু নামেই সমধিক পরিচিত এবং ওই 'আবু' নামই তাঁর কার্টুনে ব্যবহার করেন।

আবু আব্রাহাম জাঁ ককতোর একটি চমৎকার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে ককতো কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'কবি একজন মিথ্যাবাদী, যার কারবার সত্যকে নিয়ে।'

আবু বলেছেন, কার্টুনিস্টও ওই কবির মত, সত্যকে নিয়েই তার কারবার কিন্তু সেই সত্যকে অতিরঞ্জিত করেই তার সাফল্য। সবাই জানে টিউবওয়েল মানুষ বা কোন জীবজন্তু নয়। কিন্তু প্রবল খরার শেষে প্রথম বৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত টিউবওয়েল জিব বার করে জলপান করার চেষ্টা করে।

এই সূত্রে আরও দুয়েকটি কার্টুন দেখা যেতে পারে।

একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু তার পিঠে স্কুলব্যাগ নেই, সে জায়গায় রয়েছে একটি পারসন্যাল কম্পিউটার। বোঝা যাচ্ছে যে ওই কম্পিউটারই তার বই খাতা, ওর মধ্যেই রয়েছে অঙ্ক ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন।

অন্য একটি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, একটি পোলিং বুথের পাশেই রয়েছে একটি মিল্ক

বুথ। মিল্ক বুথে প্রচণ্ড ভিড়, বিরাট লম্বা লাইন, সবাই দুধের জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। অপর দিকে পোলিং বুথে কোন ভিড় নেই, লাইন নেই। বুথটা সম্পূর্ণ ফাঁকা পোলিংয়ের কাজের লোকজন বাদে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভোট দেওয়ার চেয়ে দুধ নেওয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

নির্বাচনী ব্যাপার নিয়ে আরও একটি মজার ছবি রয়েছে এই কার্টুন বইতে। নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর নির্বাচন প্রার্থী তার এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলছে, 'নির্বাচনে হেরে খুব বাঁচা বেঁচে গেছি বাবা। জিতলে নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করতে গিয়ে জান কয়লা হয়ে যেত।'

বিশ্ববিখ্যাত কার্টুনিস্ট ডেভিড লো একবার বলেছিলেন কার্টুনিস্টকে বহু শ্রম সহ্য করে সরল হতে হবে। কার্টুনটি আঁকতে যত পরিশ্রম হবে তার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হবে সেই ছবি থেকে পরিশ্রমের ছাপ তুলে ফেলার জন্যে। পাঠক যেন ছবির মধ্যে আয়াস বা পরিশ্রমের আভাস না পায়।

ডেভিড লো কথিত এই শ্রমসাধ্য সারল্য আমরা আগের যুগে শৈল চক্রবর্তী এবং প্রমথ সমাদ্দারের কার্টুনে দেখেছি যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু আসলে যথেষ্টই শ্রমসাধ্য।

এই জাতীয় একাধিক কার্টুন এই বইতে রয়েছে। একটির কথা বলি—

প্রবাদপ্রসিদ্ধ তিন বানরের কথা আমরা জানি। তার মধ্যে একজন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রয়েছে সে কিছু দেখবে না। দ্বিতীয় জন হাত দিয়ে মুখ চেপে রয়েছে সে কিছু বলবে না। আর শেষজন দু'হাত দিয়ে দু'কান ঢাকা দিয়েছে, সে কিছু শুনবে না।

বোম্বাইয়ের অরুণ ইনামদারের আঁকা কার্টুনে চতুর্থ একটি বানরের ছবি রয়েছে এই বানরটি তার নাক এক হাতে টেনে ধরে রয়েছে, তার অন্য হাতে ধরা রয়েছে একটি গান্ধীটুপি। বলা বাহুল্য সেই টুপি থেকে বদ গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা যাতে শুঁকতে না হয় তাই তার নাক টিপে থাকা।

। সর্বশেষ যে কার্টুনটির কথা বলতে যাচ্ছি সেটি উচ্চমানের নয়। কিন্তু তার মধ্যে একটা মজা আছে। এই কার্টুনটা সেই রাজীব গান্ধী সরকার পতনের পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময়কার।

ভারতবর্ষের মানচিত্র একটা এরোপ্লেনের আকারে আঁকা। সেই এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাজীব গান্ধী নেমে আসছেন, আর সেই সঙ্গে বিশ্বনাথপ্রতাপ উঠে আসছেন।

ছবিটি তেমন কিছু নয়, কিন্তু একটু মজা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও খুশবন্ত সিংহ

'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ', এই বিখ্যাত গানটির গীতিকার নিশ্চয়ই খুশবন্ত সিংহের কথা জানতেন না, জানলে এই আশ্চর্য প্রথম পঙ্‌ক্তিটি লিখতে পারতেন না, তাঁকে লিখতে হত,

'শিং আছে তাই নাম তার সিংহ।'

সত্যিই খুশবন্ত সিং সাহেবের শিং আছে। আমাদের অল্প বয়সের দক্ষিণ কলকাতার আড্ডায়, সেই 'সুতৃপ্তি' নামের দেশপ্রিয় পার্কের সাবেকি রেস্তরাঁয় মোটা মাথা লোকদের সম্পর্কে একটা চালু ফ্রেজ (Phrase) ছিল।

Acute case of horns coming out, অর্থাৎ শিং বেরিয়ে আসছে।

তেমন কাউকে জব্দ করতে হলে তাঁর ললাটের দুই প্রান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমরা সাব্যস্ত করতাম এটা শিং বেরিয়ে আসায় খুব জটিল ব্যাপার।

এতদিন পরে খুশবন্ত সিং সাহেবের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে উক্তি পাঠ করে আবার সেই পুরনো শিং বেরিয়ে আসার রসিকতাটি মনে এল।

অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, হঠাৎ খুশবন্তজী এমন কথা বলতে গেলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন উক্তি তিনি করতে গেলেন কেন?

আমরা প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে দেখতে পারি। উক্তিটি তিনি করেছিলেন শিলংয়ে। দিল্লিতে নয়, নিজের সাপ্তাহিক কলমে নয়, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই, শিলংয়ে কেন?

খুশবন্ত সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন, কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে এ রকম উক্তি করার সাহস তাঁর ছিল না। এ কথাটাও তিনি খুব নোংরাভাবে বলেছেন, বলেছেন, বাঙালির তিন পবিত্র গাভীর অন্যতম রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির সামনে এ কথা বলার তাঁর সাহস নেই।

শিলংও কিন্তু এককালে একান্ত বাঙালির শহর ছিল। এখনও সেখানে বঙ্গভাষীর সংখ্যা কিছু কম নয়। শিলংয়ের বাঙালিদের সাহিত্য সমিতি ইতিমধ্যেই খুশবন্ত সিংয়ের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

খুশবন্ত সিং শিলং গিয়েছিলেন একটি সংবাদপত্রের অনুষ্ঠানে সেখানে সৃজনশীল লেকখদের আলোচনাসভায় তিনি হঠাৎ বলে বসলেন,

১। রবীন্দ্রনাথ তেমন বড় মাপের লেখক ছিলেন না।

২। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষা ভালভাবে জানতেন না।

মজার কথা এই যে, ওই দুটি উক্তিই সেই অনুষ্ঠানে অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পাঠ করে বেশ বোঝা গেছে, সেই আলোচনাসভায় রবীন্দ্রনাথ মোটেই আলোচ্য বিষয় ছিলেন না। ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রসঙ্গও অবান্তর ছিল।

রবীন্দ্রনাথ কোন্ মাপের লেখক ছিলেন, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান কেমন ছিল এ সব প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আশি নব্বই বছর পরে এখন সম্পূর্ণ হাস্যকর, যদিও সেই আমলে এমন দু-চারটে সমালোচনার সম্মুখীন রবীন্দ্রনাথকে হতে হয়নি তা নয়।

খুশবন্ত সিংয়ের এই অবৈধ এবং অনধিকার চর্চার পরে কাগজপত্রে সুধীজন দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত যাওয়ার দরকার নেই।

প্রশ্ন অন্যত্র, খুশবন্ত সিং হঠাৎ এমন বলতে গেলেন কেন?

জবাবটা খুব সোজা। খুশবন্ত সিং সাহেবের মত পড়তি বাজারের লেখককে এই উদ্ধৃত উক্তি আবার প্রচার মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছে। এ রকম কিছু করা ছাড়া তাঁর বোধ হয় আর গত্যন্তর ছিল না।

সিং সাহেব না কি অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছাপমারা লোক। তার মানেই এই নয় যে তিনি খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক। অনেক ছাপমারা লোক জীবনে দেখেছি, যাঁরা আসলে গোমূর্খ।

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় খুশবন্ত সিংয়ের যে কলম প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তার পাঠকেরা জানেন, তিনি অত্যন্ত স্থূলরুচির, মোটাবুদ্ধির লেখক। তাঁর দুর্বলতা সুরা ও রমণী নিয়ে। তাঁর প্রতিবেদনে সাহিত্যের সামান্য ছোঁয়াও পাওয়া যায় না।

খুশবন্ত সিংকে নিয়ে 'স্টেটসম্যান' কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চমৎকার কার্টুন বেরিয়েছে--দিশি স্কচ হুইস্কির বোতল নিয়ে খুশবন্ত চেয়ারে বসে 'শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী' পাঠ করছেন আর বলছেন, 'প্লটটা তো চমৎকারই মনে হচ্ছে। কিন্তু শেক্সপীয়ার কি ভাল ইংরেজি লিখতে পারতেন?'...

তবে আমাদের মনের মত জবাব দিয়েছেন কুট্টি, আজকাল কাগজে একটি অসামান্য কার্টুনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের মূর্তির মাথায় একটি কাক বসে মলত্যাগ করছে, সেই কাকের মুখটা খুশবন্ত সিংয়ের।

অবশেষে বলি, খুশবন্ত সিংয়েরা চিরকালই এ রকম করে থাকেন। শুধু শুধু উত্তেজনা করে লাভ নেই। বরং তাঁকে আমরা অনুকম্পা, অবহেলা করতে পারি।

একটি পুরাতন গল্প

এই রম্য নিবন্ধের নামকরণে আমি সজ্ঞানে পুরাতন শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ সত্যিই এই কাহিনীটি নিতান্ত পুরনো নয়, সত্যিই পুরাতন, অতি পুরাতন।

এ সেই বিধবা বিবাহ প্রচলনের যুগ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলের কাহিনী।

এ গল্প পুরনো কলকাতার। কেউ কেউ হয়ত আগে শুনেছেন কিংবা পড়েছেন। বিশেষ করে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অনেকেরই পড়া, সেই অসামান্য গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

কলকাতার আদি যুগের কথা। কলকাতায় কোনকালেই হুজুগের অভাব ছিল না, সেকালেও তার অভাব হয়নি। বরং একটু বেশি বেশি ছিল।

একবার কলকাতায় গুজব উঠল যে মরা মানুষেরা ফিরে আসবে। গুজবটা এসেছিল নদীয়া, সম্ভবত কৃষ্ণনগর অঞ্চল থেকে।

দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়ে গেল। পনেরোই কার্তিক, রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যে মরে যাওয়া সমস্ত মানুষ পরলোক থেকে সশরীরে প্রত্যাবর্তন করবে। জেলের কয়েদিদের যেমন বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সময়ে মেয়াদ ফুরনোর আগেই ছেড়ে দেওয়া হয় তেমনিই স্বর্গের এক ক্ষমতাবান দেবতা তাঁর পুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কিছু কয়েদি খালাস করবেন। গত দশ বছরে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে সবাই ধরাধামে ফিরে আসবে।

সারা শহরে ক্রমে হইচই শুরু হয়ে গেল, পনেরোই কার্তিক মরা ফিরবে। বাংলা খবরের কাগজগুলো গুজব রটনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করল। এদিকে, বিদ্যাসাগরের বিধাবা বিবাহ বানচাল হওয়ার জোগাড়, সব বিধবারই সমস্যা দাঁড়াল আগের স্বামী যদি ফিরে আসে তাহলে কি হবে। একেবারে পরশুরামের ভূশণ্ডির মাঠের গল্পের অবস্থা দাঁড়াল।

শহরের সর্বত্র মরা ফিরে আসার গুজব। এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে লাগল জোচ্চর এবং বদমাইসেরা। তারা ফেরা মড়া সেজে বনেদি ও অবস্থাপন্ন ঘরে গিয়ে দশ বছরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। অনেক গৃহস্থের ও বিধবার ধর্ম নষ্ট হল, অনেক পরিবারের টাকা গয়না গেলো।

তখনো কিন্তু পূর্ব নির্দিষ্ট সেই পনেরোই কার্তিক, রবিবার আসেনি। আগেই হুলস্থুল পড়ে গেল। হুতোম প্যাঁচার ভাষায়, 'স্কুল বয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটির দিন প্রতীক্ষা করেন বিধবা ও পুত্রসহোদরাবিহীন নির্বোধ পরিবারেরা সেই রকম পনোরই কার্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন...যাঁর পূর্বে বিশ্বাস করেন নি, পনেরই কার্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরা ও দলে মিললেন।'

স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে হুতোম প্যাঁচা তাঁর নিজের কথাও লিখেছেন।

'ছেলেবেলা আমাদের একটি চিনের খরগোস ছিল, আজ বছর আষ্টেক হল সেটি মরেছে--ভাঙা পিঞ্জরের মাটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলাম।'

বলা বাহুল্য, এই গুজবের পরিণতি যা হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক তাই হয়েছিল।

অবশেষে পনেরোই কার্তিক এসে গেল। নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাটে দলের পর দল লোক দাঁড়িয়ে। কারণ এ রকম ধারণা করা হয়েছিল যাঁকে যে ঘাটে দাহ করা হয়েছে তিনি সেই ঘাটেই সশরীরে অবতীর্ণ হবেন। বাড়িতে বাড়িতেও পরিবারের লোকেরা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অধীর প্রতীক্ষায়।

ক্রমে পনেরোই কার্তিক দিনাবসনা হল। সন্ধ্যা হয়ে এল। মৃত ব্যক্তিদের ফিরে আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় কুয়াশা এবং শ্মশানের চিতার ধোঁয়া মিলে গঙ্গাতীরের আকাশে যে ধোঁয়াশা স্বাভাবিক সেই ধোঁয়াশার মধ্যে অনেকেই নিজের মৃত আত্মীয়ের অবয়বের আভাস পেলেন। কিন্তু সেই মৃতেরা, প্রেতলোকের অধিবাসীরা কিছুতেই নরমূর্তি ধারণ করলেন না।

অবশেষে রাত যথারীতি বাড়তে লাগল। প্রথম শীতের ঠাণ্ডা বাতাস গঙ্গার উত্তর দিক থেকে বয়ে আসতে লাগল। অতি বিশ্বাসীরা তখনো গুটিগুটি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে।

গভীর রাতে ধীরে ধীরে শ্মশান জনশূন্য হয়ে গেল। সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসার অপেক্ষায় থেকে অতি বিশ্বাসীরা অবশেষে নিজেরাই মড়ার মত ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরে গেলেন।

কলকাতার আদি যুগের একটি গুজবের অবসান হল।

রেল স্টেশন

কবিপক্ষে একবার কবিকে স্মরণ করে নিই, তারপর যথারীতি হালকা রসিকতার গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসান যাবে।

কবি লিখেছিলেন,

সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালবাসি
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে
ভাঁটির টানে কেউ বা চড়ে কেউ বা উজান ট্রেনে।

'নবজাতক' বইয়ের কবিতা। সঞ্চয়িতাতেও আছে। রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষের দিকের কবিতা, মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে লেখা।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য করে ইসটেশন লিখেছিলেন, না হলে ছন্দে আটকিয়ে যেত। আমরা অবশ্য তরল গদ্যে ইংরেজি স্টেশন শব্দটাই রেখে দিচ্ছি।

রেল স্টেশন নিয়ে গল্পের অভাব নেই। পৃথিবীর সব ভাষাতেই, সব দেশেই, যেখানেই রেলগাড়ি আছে সেখানেই রেলগাড়ি আর স্টেশন নিয়ে মজার মজার অজস্র গল্প।

সেই এক ভদ্রলোক বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করে করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে স্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দাদা, সাড়ে দশটার ট্রেন কখন আসবে?' তাঁর কথা আমরা বহুদিন ধরেই জানি। কিন্তু তাঁর সেই প্রশ্ন এখনও পুরনো হয়নি। যে কোন স্টেশনে যে কোন স্টেশন মাষ্টারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুক্ষণ পরে পরেই এ রকম প্রশ্ন শোনা যাবে।

এই সূত্রে একটি জটিল প্রশ্নোত্তরের আশ্চর্য উতোর চাপান মনে পড়ছে।

বহুক্ষণ ট্রেন না আসায় উত্তেজিত জনৈক যাত্রী প্ল্যাটফর্মের কাউন্টার থেকে সদ্য কেনা টাইম টেবিলটা স্টেশনের বড়বাবুর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বইটা ছেপেছেন কেন?'

বড়বাবু প্রাচীন, বিচক্ষণ লোক, চোখে গোল কাঁচের চশমা, গায়ে গলবন্ধ কোট। মৃদু হেসে পালটা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

বড়বাবুর এই শান্তভাব দেখেও যাত্রী ভদ্রলোকের রাগ মোটেই কমলো না। তিনি ভূপতিত টাইম টেবিলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ট্রেন যদি সময়মত না আসে তা হলে এই বইটা, এই টাইম টেবিলটা আপনার কোম্পানি ছাপায় কেন?

এটা কি কাজে লাগবে?'

এবার মোক্ষম জবাব দিলেন বড়বাবু। মেঝে থেকে টাইম টেবিলটা কুড়িয়ে ভদ্রলোককে

ফেরত দিতে দিতে তিনি বললেন, 'দাদা, যদি এই বইটা না থাকবে, তা হলে কি করে বুঝবেন যে রেলগাড়ি সময়মত চলছে না?'

রেলগাড়ি সময়মত চলুক না চলুক রেলগাড়ি যত অসময়েই যাতায়াত করুক যে কোন সময়েই ভিড় গিজগিজ করছে। রেলগাড়িতে ভিড়, স্টেশনে ভিড়, প্ল্যাটফর্মে ভিড়। সে ভিড়ের কোন জাত নাই, ছেলে বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সব ধর্মের, সব ভাষার সব রকম মানুষ সেই ভিড়ে।

ঊনবিংশ শতকে একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল, যতদূর রেলগাড়ি যাবে, সভ্যতাও ততদূর যাবে। তখনও মোটরগাড়ি, ওমনিবাসের যুগ আসেনি। আসেনি দিগন্তভেদী হাইওয়ে।

রেলগাড়ির কথা যথাসময়ে বলা যাবে। আপাতত আমরা প্ল্যাটফর্মে রয়েছি।

প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক একটা পুরনো গল্প স্মরণ করা যেতে পারে।

একটি গল্প পঞ্চাশের দশকের এক কৌতুক শিল্পী জলসায়, অনুষ্ঠানে নকশা করে দেখাতেন। সেই ভদ্রলোক বহুদিন বিগত হয়েছেন কিন্তু এতদিন পরে আজও তাঁর কৌতুক কাহিনীগুলি স্মরণযোগ্য।

কাহিনীটি খুব বাস্তব ও সাদামাটা। এক ভদ্রলোক রেলগাড়ির কামরায় বেঞ্চির এক পাশে জানলার ধার ঘেঁষে বসে আছেন। পাশেই ভিড়ের প্ল্যাটফর্মে একজন ফেরিওলা গোছের লোক কামরার জানলা ঘেঁষে বারবার চলে যাচ্ছে, আর ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'তোর মুখে কালি। তোর মুখে কালি।'

এ রকম বেশ কয়েকবার ঘটল।

ভদ্রলোক কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। এমন কি একবার উঠে বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে এলেন। কিন্তু মুখে তো কোথাও কোন কালি লেগে নেই।

আবার সিটে এসে বসতেই কিন্তু সেই ফেরিওয়ালাটি এসে বলে গেল, 'তোর মুখে কালি।' ভদ্রলোক এবার অস্থির হয়ে উঠলেন। পরের বার লোকটি এসে 'তোর মুখে কালি' বলতেই তিনি তার জামার কলারটা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন, ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ইয়ার্কি হচ্ছে?'

অবশ্য প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। আচমকা লোকটির কলার ধরতেই তার হাতের গামছা ঢাকা ঝুড়িটা পড়ে গেল, সেটা ভর্তি টুকরো টুকরো তরমুজের ফালি। লোকটা এতক্ষণ ধরে জানলায় ঘুরে ঘুরে 'তরমুজের ফালি' হেঁকে যাচ্ছিল, তার দ্রুত উচ্চারণ প্ল্যাটফর্মের কোলাহলে মিলে গিয়ে শোনাচ্ছিল, 'তোর মুখে কালি'।

ছোটবেলায় ছড়ায় শুনেছি,

রেলগাড়ি ঝমঝম,

পা পিছলে আলুর দম।

দেশ গাঁয়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনও রেল লাইন ছিল না, নিকটতম রেল লাইন ছিল, তাও প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে, সেও বড় বড় নদীনালা পেরিয়ে। কিন্তু এই ছড়াটি সেই অগম্য আমাদের ওখানেও পৌঁছেছিল।

এই ছড়ার মধ্যে 'আলুর দম' শব্দটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অজ্ঞাত

ছড়াকার অনায়াসেই বলতে পারতেন, 'রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে জান খতম।' এতে ছন্দ মিলের বিশেষ প্রকার ভেদ হত না, কিন্তু ছড়াটি মারা পড়ত।

শিশুদের কাছে লোভনীয় 'আলুর দম' কথাটির এখানে অন্য একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে। লাল ঘন ঝোলের মধ্যে গোলাকার আলু কেমন একটা গলাকাটা মানুষের মাথার দেহহীন নরমুণ্ডের কল্পনা করা যায়। রেলগাড়িতে পা পিছলে পড়লে গলা কাটা যাবে এমন একটা আভাস রয়েছে আলুর দমের ব্যবহারে।

অতঃপর ছড়া থেকে গল্পে যাই।

প্রথমে প্রবাদপ্রসিদ্ধ সর্দারজির গল্পটা বলে নিই।

সর্দারজি সস্ত্রীক হাওড়া স্টেশনে গেছেন ট্রেন ধরতে। দূরপাল্লার ট্রেন ধরবেন, অনেকটা দূরে যেতে হবে তাঁকে। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সর্দারজি কিন্তু তাঁর আর ট্রেনে ওঠা হয় না।

সর্দারজিকে বহুক্ষণ দেখে টিকিট চেকারের বেশ একটু সন্দেহ হল। তিনি গিয়ে তাঁর টিকিট চেক করলেন। তারপর টিকিটে গন্তব্যস্থান দেখে বললেন, 'ওই তো সামনে অমৃতসর মেল রয়েছে। আপনি ওটায় উঠে যাচ্ছেন না কেন?'

সর্দারজি ওই পরামর্শ নাকচ করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই ট্রেনে গিয়ে উঠি আর আপনি আমাকে ধরে চালান করে দেন।'

চেকার শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'চালান করব কোন্ অপরাধে?'

সর্দারজি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হেসে বললেন, 'এটা অমৃত সর মেল। মেল ট্রেন। উঠব কি করে, আমার সঙ্গে ফিমেল রয়েছে যে।'

অন্য একজন যাত্রীর কথা জানি। তিনি স্টেশনের কাউন্টারে শ্রীরামপুরের টিকিট চাওয়ায় টিকিট বিক্রেতা কেরাণীবাবু একটু বিস্মিত হয়েছিলেন।

ভদ্রলোক আবার বলেছিলেন, 'শ্রীরামপুরের টিকিট। তাড়াতাড়ি একটা শ্রীরামপুরের টিকিট।'

কাউন্টারের কেরাণীবাবু তখন বলেছিলেন, "দাদা সব পারব। ভূ-ভারতের সব জায়গার টিকিট আমি আপনাকে দিতে পারব। কিন্তু শ্রীরামপুরের টিকিট দিতে পারব না।'

কেন শ্রীরামপুরের টিকিট পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, এ ধরনের সমস্যা বা অবস্থা একমাত্র শিবরাম চক্রবর্তীর পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব। ভদ্রলোক শ্রীরামপুর থেকে শ্রীরামপুরের টিকিট চেয়েছিলেন। অবস্থার গতিকে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি শ্রীরামপুর থেকে ফিরছেন।

রেলের টিকিট কাউন্টারের কথায় মনে পড়ল বড় বড় স্টেশনে পাশাপাশি অনেকগুলো কাউন্টার। অনেকদিন আগে একবার হাওড়া স্টেশন থেকে আমার এক গ্রাম্য ও কৃপণ আত্মীয়ের সঙ্গে চন্দননগরে যাচ্ছিলাম। বোধহয় সেই বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে।

আমার সেই আত্মীয় জ্ঞাতি সম্পর্কে তিনি আমার কাকা হতেন, হাওড়া স্টেশনে এসে আমাকে কাউন্টারের অদূরে যাচাই করেছিলেন চন্দননগরের টিকিটের দাম কত। অবশেষে নিরাশ হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'সব গুলোই সব সেয়ানা। সকলেই এক দাম বলছে।'

সজনীকান্ত দাস

কবি নজরুল ইসলামের ব্যঙ্গ রচনা সম্পর্কে লেখার পরে মনে হল এই সুবাদে নজরুলের সমসাময়িক আরও দুয়েকজনের ব্যঙ্গ-সাহিত্যের কথা স্মরণ করলে ভাল হয়।

সজনীকান্ত দাসের কথা বলি; 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার বহু বিতর্কিত সজনীকান্ত।

'শনিবারের চিঠি'র কথা একালের পাঠক হয়ত ভাল করে জানেন না। জানার কথাও নয়, 'শনিবারের চিঠি' উঠে গেছে সেও বহুকাল হয়ে গেল। অথচ একদা শনিবারের চিঠির একেকটি সংখ্যা প্রকাশিত হত আর হইচই পড়ে যেত। তার প্রধান কারণ ছিল 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্য বিষয়ক ব্যঙ্গ কটাক্ষ, যার রচনাকার ছিলেন সজনীকান্ত, যিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব কাউকে রেয়াত করতেন না, সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সবাইকে ছিন্নভিন্ন করতেন।

বিষ্ণু দে'র 'জল দাও' কবিতা পড়ে সজনীকান্ত লিখেছিলেন যে, শুধু জল নয়, জলের সঙ্গে দই মিশিয়ে কবির মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া উচিত। অচিন্ত্যকুমার যখন পরমপুরুষ লিখছিলেন, সেই সময় সজনীকান্ত বললেন যে, সবার মাথায় সার দেন যে মা সারদা, তিনি এই লেখকের মাথায় কিঞ্চিৎ সার দিলে পারতেন।

সজনীকান্ত দাসের সংবাদ-সাহিত্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সব আমার মনে নেই, অনেককাল আগের কথা, আমার কালেরও আগের। তা ছাড়া হাতের কাছে পুরনো শনিবারের চিঠি বাঁধান খণ্ডগুলি পাচ্ছি না। আমি সম্প্রতি বাড়ি বদল করায় সব বইপত্র অগোছাল হয়ে আছে।

তবে সজনীকান্তের 'বঙ্গ রণভূমে' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতার বই খুঁজে পেয়েছি। এই কাব্যগ্রন্থটির নাম এখনকার পাঠক-পাঠিকা না জানলেও একদা পরিমল গোস্বামীর মত বিদগ্ধ সমালোচক 'বঙ্গ রণভূমে' বইটিকে ব্যঙ্গ রচনার শ্রেষ্ঠ নির্দশনরূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

'বঙ্গ রণভূমে'র বিখ্যাত কবিতাগুলি ছিল 'সোনার বাঙলা', 'সোনার পাথরবাটি', 'পাতাধার', 'মাটির গুণ' ইত্যাদি।

'সোনার পাথরবাটি' কবিতায় সজনীকান্ত লিখেছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশে তবু রঙ্গে ভরা,/ বারি নাই এক বিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।/ মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি/মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি'।

প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ধার করা, বাকিগুলি সজনীকান্তের। ব্যাপারটাকে চমৎকার খেলিয়েছেন সজনীকান্ত, ব্যঙ্গ কবিতার ঝাঁঝাল মেজাজ বেশ পরিষ্কার।

'সোনার বাঙলা' কবিতায় আক্রমণ আরও সরাসরি এবং ধারাল।

'অহো, সোনার বাংলা সোনার বাঙলা/সোনার বাঙলা আলবৎ,/যেথা বাহির হইতে গুল্মের আসি/বৃদ্ধি পেতেছে শালবৎ'।

সেই কতকাল আগে সজনীকান্ত তাঁর পত্রাধার কবিতায় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। আমি দুটি পঙ্‌ক্তির মাত্র উল্লেখ করছি, তবে কবিতাটি আগাগোড়া চমৎকার।

পঙ্‌ক্তি দুটি হল ' হেথা অবতার কাতারে কাতারে/জাগে বদ্বুদ সম,/পূজা প্রাঙ্গণে গড়িয়া উঠিছে/পলিটিক্স অনুপম।

অতঃপর আর একটি কবিতার কিছু অংশ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। দুগ্ধসেবনকারী গণেশ ঠাকুর এবং গোমাতা পূজার বর্তমান পটভূমিকায় কবিতাটি অবশ্যই স্মরণযোগ্য। কুমোর ঘরে দেবতা ওঠে গজায়ে/ফুঁড়িয়া মাটি উঠিছে শিবলিঙ্গ,/দেবতা হয়ে লভিছে গরু প্রণতি/সিঁদুর লাল হতেছে তার শৃঙ্গ/গোবরপচা অন্ধকার গোয়ালে/আহার বিনা দেবতা জরাগ্রস্ত, / গরুর নামে হতেছে গরু মানুষে/ভূতের নামে জীবিত ভয়ত্রস্ত।

বুদ্ধু ও বুদ্ধিমান

বুদ্ধু শব্দের মানে, সবাই জানে বোকা।

শব্দটি খুব সম্ভব হিন্দি ভাষা মারফত বাংলায় এসেছে। হিন্দিতে বলে, 'বুদ্ধু কাঁহাকা'। যার মানে হল 'বোকা কোথাকার'। বাংলাতেও অবশ্য আজকাল বুদ্ধু কথাটা খুব চলছে। লোকে আর 'বোকা কোথাকার' বলছে না, বলছে, 'বুদ্ধু কোথাকার'।

বোকা কেমন সাদামাটা শব্দ, তেমন জোর নেই শব্দটির গায়ে। সেদিক থেকে বুদ্ধু ধ্বনি মাহাত্ম্যে এবং দুই উকারের মিলে সেই সঙ্গে দ আর ধ সংযুক্তিতে খুব জোরদার শব্দ।

আমি ভাষাবিদ্ নই। কিন্তু আমার কেমন মনে হয়, বুদ্ধি শব্দ থেকে এসেছে বুদ্ধু শব্দটা। কিন্তু তাই বা হয় কি করে? যার বুদ্ধি নেই, সেই তো বুদ্ধু।

সে যাই হোক, ভাষাবিজ্ঞানের কচকচিতে যাব না। দু-একটা আসল বুদ্ধুর গল্প বলি।

এক সরকারী খনন-অধিকর্তা কার্যস্থল থেকে অর্থাৎ যেখানে তাঁর কাজ হল বড় বড় গর্ত খোঁড়া, সেই জায়গা থেকে হেড অফিসে জরুরি বার্তা পাঠালেন, 'গর্তগুলো খুঁড়ে যত মাটি বেরোচ্ছে, তার থেকে কম মাটি লাগছে গর্ত বোজানোর সময়। উদ্বৃত্ত মাটি দিয়ে কি করব? কোথায় ফেলব?'

হেড অফিসের বুদ্ধু আরও বড় বোকা, তিনি তড়িৎগতিতে নির্দেশ পাঠালেন, 'এ নিয়ে চিন্তার কি আছে! পাশাপাশি আরও বড় বড় গর্ত করে সেই সব গর্তে এই মাটিগুলো ফেলে দাও।'

আরেকবার এক কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী একই খালের ওপরে পাশাপাশি দুটি একই রকমের ব্রিজ দেখে জানতে চেয়েছিলেন, 'এ কি ব্যাপার?'

স্থানীয় কর্তা জানিয়েছিলেন, 'সরকারি নির্দেশ হিন্দি ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই এসেছিল। ইঞ্জিনীয়ারসাহেব দুটো ভাষাই জানেন। তাই দুটো আদেশই তামিল করে তারপর দুটো একই ব্রিজ বানিয়েছিলেন।'

শুধু ব্রিজ বানান বা গর্ত কাটা নয়, সাধারণ কথাবার্তার ব্যাপারেও বুদ্ধুদের অসাধারণত্ব সর্বদাই লক্ষণীয়। এটা তাদের চালাক হওয়ার চেষ্টার মধ্যে পড়ে।

বোকা তথা বুদ্ধুদের সারা জীবনের স্বপ্ন চালাক হওয়ার। এর জন্যে তারা কত কি করে? টাই আর ফিতেওলা জুতো পরে গটগট করে হেঁটে যায়। বিনা কারণে মুচকি-মুচকি হাসে। হঠাৎ-হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ফিলটার সিগারেটের উলটোদিকে আগুন ধরিয়ে প্রথম সুখটানটা দিয়ে ঘন ঘন হেঁচকি তুলতে থাকে।

প্রিয় পাঠিকা, এই লোকটিকে অবহেলা করতে যাবেন না। কারণ, নিজেকে স্মার্ট প্রমাণ করার জন্য যে দু-চারটি প্রশ্ন করতে পারে তার নমুনা এ রকম।

বিখ্যাত শিকারী পদ্মশ্রী নিশিকান্ত দে চৌধুরি সাতাশিবার ঝাড়গ্রামে পাগলা হাতি শিকার করতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে একবার তিনি পাগলা হাতির আক্রমণে নিহত হন।

তিনি কোন্‌বার শিকার করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুবই সোজা। শেষবার তিনি নিহত হয়েছিলেন। কারণ, তার আগে নিহত হলে তো আর শিকার করতে যাওয়া যায় না।

আমার পরামর্শ, আপনি এ ধরনের লোকের এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন না। মুচকি-মুচকি হাসতে থাকবেন।

যথারীতি এই বুদ্ধুটিও নিজেকে খুব চালাক ভাবেন। একদিন এক প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তিনি বুদ্ধির খেলায় চ্যালেঞ্জ জানালেন। বললেন, 'আপনি আমাকে একটা করে প্রশ্ন করবেন, আমি তারপর আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি উত্তর দিতে না পারলে আমাকে একশ' টাকা দেবেন। আমি উত্তর দিতে না পারলে আপনাকে একশ' টাকা দেব।'

প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি বুদ্ধুর এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে শুধু বললেন, 'আমি তো আপনার মত তুখোড় নই। আমি উত্তর না দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেব। আপনি না পারলে দেবেন একশ' টাকা।'

বুদ্ধু এই প্রস্তাবে একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে আপনিই প্রথম প্রশ্নটা করুন।'

বুদ্ধিমান বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো একটা জন্তু যার ছ'টা পা, চোখ তিনটে, লেজ দিয়ে আগুন বেরোয়, এদিকে কোন দাঁত নেই, চোখ নেই, এমন কি জিবও নেই। সেই জন্তুটার নাম কি?'

অনেক রকম আকাশ-পাতাল ভাবলেন বুদ্ধু, অবশেষে আত্মসমর্পণ করে বলল, 'বলতে পারলাম না। এই নিন একশ' টাকা।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বুদ্ধু প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলুন তো জন্তুটা কি?'

বুদ্ধিমান বললেন, 'আমিও জানি না। এই নিন পঞ্চাশ টাকা।'

সরল ও বোকা

বুদ্ধুদের নিয়ে যখন লিখেছি, তা হলে এবার সরল এবং বোকাদের নিয়েও লিখতে হচ্ছে।

প্রথমেই মনে রাখা ভাল, চলতি কথায় সরল এবং বোকা শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক বলে ধরে নেয়া হয়।

যে-কোন বোকা লোককে আমরা ভদ্রতা করে বলি, 'তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক'। আবার প্রকৃতই সরল লোককে আমরা বোকা বলে গণ্য করি অনেক সময়েই। আসলে বোকামি এবং সারল্যের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পর্দা আছে, যা এতই হালকা যে সহজে নজরে আসে না।

এক ব্যক্তির মনে পাগল হওয়ার জন্যে অদম্য বাসনা দেখা দেয়। তিনি যেন কার কাছে শুনেছিলেন যে কাক ধরে কাকের মাংস রান্না করে খেলে পাগল হয়। পাগল হওয়ার মানসে ওই ভদ্রলোক কাক ধরে খাওয়া আরম্ভ করেন।

তেতো, শক্ত, দুর্গন্ধ কাকের মাংসের ঝোল দিনের পর দিন খাওয়ার পরে সেই ভদ্রলোক নাকি রীতিমত আক্ষেপ করেছিলেন, 'এত কাকের মাংস খেলাম, তবু তো কিছুতেই পাগল হতে পারলাম না।'

এই কাল্পনিক ভদ্রলোকটিকে কেউ কেউ হয়ত সত্যিই পাগল বলবেন। আমি হয়ত বলব বোকা। আর আপনি হয়ত ভদ্রতা করে 'খুব সরল প্রকৃতির লোক' বলবেন।

এখানে সরল বা বোকা লোকটির আচার-আচরণ পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এ রকম হয় না। আরেকটা সরল কাহিনী বলি।

ভরদ্বাজবাবু ব্যাচেলার মানুষ। একা থাকেন, ভৃত্য ভৃগুচরণের ওপরে আর নির্ভর করা যাচ্ছে না। ভৃগুর বড় খরচের হাত।

ভরদ্বাজবাবু আর ভৃগু। এই সামান্য দুজনের সংসারে কতটুকুই বা প্রয়োজন, কিই বা লাগে। কিন্তু ভৃগু গাদা গাদা করে জিনিস কিনে আনে।

সাতদিনে এক কেজি সরষের তেল খরচ হয়। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চাল, ময়দা, চিনি, নুন।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জোর পরামর্শ করে ভরদ্বাজবাবু ভৃগুর খরচের হাত বেঁধে দিতে চাইলেন। তার হাতে মাসকাবারি টাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো ভৃগু, সারা মাসের খরচার টাকা তোমার হাতে দিলাম বটে কিন্তু বেশি টাকা একসঙ্গে খরচা করবে না।'

ভৃগু বলল, 'ঠিক আছে।'

ভরদ্বাজবাবু ভৃগুকে ভালভাবেই চেনেন। তিনি বললেন, 'শোন, ঠিক আছে বললে হবে না। যা বলছি, তাই করবে। এখন থেকে দৈনিকের বাজার দৈনিক করবে।'

এই কথা বলার পরে ভৃগুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভরদ্বাজবাবু দৈনিকের কেনাকাটার ফর্দ করে দিলেন। সরষের তেল দৈনিক একশো গ্রাম, চাল আড়াইশো গ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভৃগু মনিবের সব কথা মন দিয়ে শুনল কিন্তু হাতে মাসের টাকাটা পেয়েই আবার বিরাট একটি বাজার করে ফেলল। চার কেজি সরষের তেল, এক কেজি ঘি, বিশ কেজি চাল----এই রকম বিস্তৃত বাজার।

বাজার দেখে ভরদ্বাজবাবু খেপে গেলেন। ভৃগুকে একচোট ধমকালেন তিনি। বললেন, 'এত করে তোমাকে বললাম কম করে জিনিস কিনবে, দিনের দিন বাজার করে আনবে, এত সব চাল-ময়দা, ঘি-তেল এনেছ কেন?'

ভৃগু বলল, 'দোকান থেকে অল্প পরিমাণ জিনিস দিতে চায় না। তা ছাড়া বেশি করে কিনলে দামে সুবিধে হয়, ওজন ঠিক থাকে।'

ভরদ্বাজবাবু তবু ছাড়লেন না, এবারে একটা কঠিন কথা বললেন, 'আমি যদি আজ মারা যাই, তা হলে এত জিনিস কি কাজে লাগবে?'

নির্বিকার ভৃগুচরণ উত্তর দিল, 'কেন বাবু, আপনার শ্রাদ্ধ তো হবে।'

এর পরে ভরদ্বাজবাবু তাঁর ভৃত্য শ্রীমান ভৃগুচরণ-এর শ্রাদ্ধ করেছিলেন কিনা সেটা এই গল্পের বিষয় নয়। তবে এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, ভৃগুর হাতটান থাকতে পারে। সে বাজার থেকে দু-চার পয়সা লাভ রাখতে পারে, কিন্তু সে একজন সরল প্রকৃতির মানুষ। কথার মারপ্যাঁচ বিশেষ বোঝে না।

পুনশ্চ:

এবারের সরলতার শেষ উদাহরণটি মর্মান্তিক। রেল স্টেশনের সামনের এক দোকানে এক খদ্দের গিয়েছেন একটা ইঁদুর ধরার খাঁচা কিনতে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি করছেন।

খদ্দের দোকানিকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।'

সরল দোকানদার বললেন, 'না দাদা। ট্রেন ধরার মত বড় খাঁচা আমার কাছে নেই।'

পরিত্যক্ত পরিহাস

রবীন্দ্রনাথের রচনায় হাস্য-পরিহাস এবং ব্যঙ্গ-কৌতুকের অংশ খুব কম নয়। গত ইংরেজি শতকের শেষ দুই দশকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যৌবনে তিনি ব্যঙ্গবহুল অনেক কবিতা ও গদ্য লিখেছিলেন, যার অধিকাংশই ছিল সোজাসুজি আক্রমণাত্মক।

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অনেক রচনাই পরবর্তীকালে গ্রন্থভুক্ত করেননি, বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই এটা তাঁকে করতে হয়েছিল।

সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় গ্রন্থাকারে পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের 'হাস্য ও ব্যঙ্গ কৌতুক' নামক একটি প্রবন্ধে এই জাতীয় গ্রন্থবর্জিত রচনার একটা খোঁজ দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'দামুচামু' বিষয়ক একটি ব্যঙ্গ কবিতা, যা কি না 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই ব্যঙ্গ কবিতাটির কিছু অংশ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ডে সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। কবিতাটির প্রথম এবং শেষ স্তবক দুটি হল,

দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে।
(আমার দামু, আমার চামু।)...

...এস বাবু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার।
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার।
(হায় দামু, হায় চামু।)...

এই প্রসঙ্গে ওই সময়ের আরেকটি কবিতার কথা বলি, যেটি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ে চমৎকার পরিহাস।

'খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকামুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াইনাকো খবর খুঁটে।

এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে।
নাকে-চোখে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয়না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।'

কবি হলেন ভাবের ভক্ত, তিনি সাংবাদিকের মত খুচরো খবরের কারবারি নন। দিনের শেষে পাপোষে মুছে মুছে সেগুলো তিনি ঝেড়ে ফেলেন। এই মজার কবিতাটিও কবি গ্রন্থাকারে সঙ্গত কারণেই অন্তর্ভুক্ত করেননি।

এবার কবিপরিত্যক্ত গদ্য পরিহাসের উদাহরণ দেখা যাক। এই গদ্যরচনাগুলো সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায় যে, অনুরূপ, প্রায় কাছাকাছি রচনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইতে, রেখেছিলেন, হয়ত সেই জন্যেই এগুলো বর্জন করেছিলেন, অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বদল করে অনুরূপ কিছু ব্যঙ্গ রচনা বইতে দিয়েছিলেন।

বর্জিত রচনাগুলিতেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ রসবোধের যথেষ্টই পরিচয় রয়েছে। একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

'...আমি যতই ভাবতে লাগলুম আমার উৎসাহ ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। সভায় দাঁড়িয়ে আমি ততই অনর্গল বলতে লাগলুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে আমাকে নিষেধ করবার কেউ রইল না।

শেষকালে দুজন ছোকরা এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলো। বাড়িতে ফিরে এসে আমার কালাচাঁদ খানসামাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোর করে বসিয়ে বাকি বক্তৃতাটুকু তাকে শুনিয়ে তবে রাত্রিরে একটু ঘুম হয়।...'

চমৎকার রবীন্দ্রনাথীয় রসিকতা। এর পর অন্য এক বর্জিত অংশ থেকে আরেকটু উদাহরণ দিয়ে শেষ করি।

'...আমি বেশ আছি। আরামে আছি। নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনোরূপ কষ্ট হয় না এ কথা যদি একবার প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি।'...

কুমারেশ ঘোষ

সম্প্রতি একজন সুরসিক লেখক এবং নিপাট ভদ্রলোক পরলোক গমন করেছেন। আমার সাহিত্য জীবনের দীর্ঘ-অভিজ্ঞতায় দেখেছি এ দুটি গুণের সমাহার সব ক্ষেত্রে হয় না।

পরিণত বয়েসে, বোধহয় তাঁর বিরাশি বছর বয়েস হয়েছিল, কুমারেশ ওষুধ-চিকিৎসা, নার্সিংহোম বা হাসপাতালের একালীন বাধ্যতামূলক দীর্ঘ যন্ত্রণার ভাগী না হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর জন্যে শোক করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করার অবকাশ আছে।

মাত্র কিছুদিন আগে কলকাতাতেই মহাবোধি সোসাইটি হলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল। চিরাচরিত মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে দেখে এগিয়ে এসে কুশল সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

কুমারেশ ঘোষ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। উদ্যোগী চরিত্রে অনেক সময় সততার অভাব দেখা যায়। কিন্তু কুমারেশবাবু প্রকৃত সচ্চরিত্র ভদ্রলোক ছিলেন। বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে পঁচাত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কুমারেশবাবুদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল মেশিনারির অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল কুমারেশ ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন।

ছোট ছাপাখানা থেকে শুরু করে লেদমেশিন, ঢালাই মেশিন, ধান-গম ভাঙার কল হাজার রকম যন্ত্রের উৎপাদক এবং বহুক্ষেত্রে উদ্ভাবক ছিল ওরিয়েন্টাল মেশিনারি। অভিভক্ত বাংলায় একদা বহু বিখ্যাত, ঘরে ঘরে ব্যবহৃত ও সমাদৃত যশোহর চিরুণি কুমারেশবাবুদেরই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত হত।

বহুকাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালিকে আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। কুমারেশবাবু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জেলা খুলনার লোক ছিলেন, তিনি তাঁর শেষ ভাবশিষ্য।

কিন্তু জলাঞ্জলির এই পৃষ্ঠায় কুমারেশবাবুকে আমি এই সব কারণে স্মরণ করছি না। তাঁর কথা বলছি একজন রসসাহিত্যিক হিসেবে।

কুমারেশ ঘোষ দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর ধরে যষ্ঠিমধু নামে একটি সরস পত্রিকা সম্পাদনা এবং পরিচালনা করেছেন। এ দেশে যেখানে সাময়িক পত্রিকার গড় পরমায়ু এক থেকে দেড় বছর সেখানে তেতাল্লিশ বছর ভাবা যায় না। এই সময়ের মধ্যে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষের' মত বিখ্যাত পত্রিকা উঠে গেছে। মূলত রঙ্গব্যঙ্গের যে সব সাময়িকী ছিল, যেমন 'শনিবারের

চিঠি'র মত দুর্ধর্ষ পত্রিকা, 'সচিত্র ভারত' কিংবা দীপ্তেন সান্যালের, 'অচলপত্র' কিছুই শেষ পর্যন্ত টেকেনি।

'যষ্ঠিমধুকে' 'বিরস বাংলার সরস পত্রিকা' বলে অভিহিত করেছিলেন কুমারেশবাবু। কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র, হাসির গল্প ও কবিতা, রঙ্গ-তামাশা টিকাটিপ্পনি একটি সরস পত্রিকার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই যষ্ঠিমধুতে ছিল।

'যষ্ঠিমধু'র বহু লেখাই কুমারেশ ঘোষ নিজে লিখতেন। সব অবশ্য স্বনামে নয়। কোনটা লিখতেন য-ম-স (মানে যষ্ঠিমধু সম্পাদক) এই নামে, সাহিত্যের হাটে নামক একটি নিয়মিত সাহিত্যসংবাদ লিখতেন, এ, ডি কুমারস্বামী নামে। এই রকম অজস্র, তাঁর বহু অস্বাক্ষরিত রচনাও 'যষ্ঠিমধু'তে থাকত।

অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক ছিলেন তিনি। তিনি লেখেননি সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, শিশুসাহিত্য সবই তিনি রচনা করেছেন। লিখেছেন একাধিক সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গ বইটির পুরো নাম রঙ্গপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ। এখানেও তিনি তাঁর রসিক সত্ত্বা রক্ষা করেছেন।

বেশ কয়েকটি সংকলনগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে অবশ্যই পাঠ্য আড্ডার অভিধান এবং সরস কথামৃত এবং মনীষী রঙ্গকথা। নামেই বইগুলির পরিচয়।

আমার ধারণা কুমারেশ ঘোষ অন্তত একশটি বই রচনা ও সম্পাদনা করেছিলেন।

কুমারেশ ঘোষ খুব জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এ কথা হয়ত বলা যাবে না। তিনি খুব বড় লেখক ছিলেন এ কথা বলাও অনুচিত হতে পারে। কিন্তু আজীবন সহস্র কাজ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও রসসাহিত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই সহজ সরল মানুষটিকে চট করে ভোলা যাবে না।

নিজের সম্পর্কে কুমারেশবাবু সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি :

মিছিল হয়েছে বার,
তুমি-আমি সবাই মিছিলে
তুমি যদি লজ্জা পাও,
থেমে যাও, বসো পথপাশে,
মিছিল যাবে না থেমে,
তুমি নেই জানবে না কেউ,
কালের সমুদ্রতীরে
মানুষ চলেছে পেতে বৈচিত্র্যের ঢেউ ॥

আগরতলা বইমেলা এবং একজন মোটা মানুষ

কলকাতা বইমেলা, যার পোশাকি নাম কলিকাতা পুস্তকমেলা, সেই মেলার মতই জমজমাট আগরতলা বইমেলা। আকারে ও আয়তনে এতটা না হলেও উৎসাহে ও আন্তরিকতায় আগরতলা সেটা পুষিয়ে দিয়েছে। মেলার ক'দিন, শুধু আগরতলা শহর নয় পুরো ত্রিপুরা রাজ্য বইমেলামুখী।

এবারের এই আগরতলা বইমেলায়, যা সদ্য সমাপ্ত হল, কোথা থেকে কিভাবে যেন একজন অতিশয় মোটা মানুষ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন উৎসবে, মেলায় দু-চারজন বেখাপ্পা মানুষকে চিরদিনই দেখা যায়, কিন্তু এবারের অতিথি বড় বেশি গোলমেলে ছিলেন।

মেলার উদ্বোধন দিবসেই এই স্থূলদেহী ভদ্রলোক সকলের দৃষ্টিগোচর হন। শুধু দৃষ্টিগোচর হওয়া নয়, উদ্বোধনী মঞ্চে দেখা গেল বিশাল ভুঁড়ি গলাবন্ধ কোটের নিচে ঢেকে ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখে মাননীয় রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রীর পাশে বসে রয়েছেন। অনেকের মনে সঙ্গতকারণেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, এই লোকটি ওখানে পৌঁছল কি করে? কিন্তু ভদ্রলোক শুধু বিশালদেহী নন, কিঞ্চিৎ আভাসে বোঝা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠস্বরও অতিশয় বাজখাঁই। ফলে কেউ আর তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পাননি।

এবং এখানেই শেষ নয়, ভুল করে কিংবা না বুঝে সেই মোটা ভদ্রলোককে উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে ডাকা হল। আর সে কি বক্তৃতা! রাজ্যপাল মহোদয় পর্যন্ত তাঁর ভাষণকালে স্বীকার করলেন, এই বক্তৃতার পরে আর ভাষণ দেওয়ার মানে হয় না।

বৃষ্টি এলে টিনের চালে যেমন ঝমঝম করে শব্দ হয়, ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনে সভাকক্ষে নির্ভেজাল হাসির রোল উঠল।

ভদ্রলোক নিজের কথা কিছুই বলেননি। বললেন,

...'এই ত্রিপুরার পাশেই শ্রীহট্ট জেলার লোক ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। মুজতবা এক ভদ্রমহিলার কথা বলেছিলেন। মহিলা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, মানে যেখানে সব রকম জিনিস স্টেশনারি, মুদি জামাকাপড়, বই-খাতা ইত্যাদি প্রায় সব কিছু পাওয়া যায়, সেই দোকানে এসেছিলেন তাঁর স্বামীর জন্মদিনের একটা উপহার কিনতে। দোকানদার নানারকম জিনিস দেখালেন, আফটার সেভ লোশন থেকে রঙিন নেকটাই পর্যন্ত কিছুই ভদ্রমহিলা নিলেন না, প্রত্যেকবারই বললেন, 'এ জিনিস আমার স্বামীর একটা আছে।' অবশেষে অপারগ হয়ে দোকানদার ভদ্রমহিলাকে বইয়ের কাউন্টারে নিয়ে গেলেন, 'তা হলে, আপনার স্বামীকে একটা ভাল বই উপহার দিন, দেখুন এই বইটা নতুন বেরিয়েছে।'

ভদ্রমহিলা কিন্তু বিনীতভাবে এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, 'আমার স্বামীর বইও একটা আছে।'...

মুজতবার এই বিখ্যাত গল্প সকলেরই জানা, তবু এসব গল্প কখনও পুরনো হয় না। সভাস্থ প্রায় প্রত্যেকেই হাসতে লাগলেন, কিন্তু হাসির শুরু হল এখানে।

হাস্যরোল শেষ হওয়ার জন্যে মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পরে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে মোটা ভদ্রলোক বললেন,

...'এর পরের বছরের ঘটনাটা সৈয়দ সাহেব বলেননি। ঘটনাটা আমি বলি, সেই ভদ্রমহিলা আবার সেই দোকানে গিয়েছেন। দোকানদার কিন্তু তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। অবাক কাণ্ড। মহিলাএবার দোকানিকে বললেন, বই দেখাতে, তিনি একটি বই কিনতে এসেছেন। গত বছরের অভিজ্ঞতা দোকানদার ভোলেননি, তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'সে কি, আপনাদের বাড়িতে একটা বই আছে না?' মহিলা লজ্জারক্তিম মুখে স্বীকার করলেন, 'তা আছে বটে, কিন্তু সেটা আমার স্বামীর বই। এদিকে আমার জন্মদিনে আমার স্বামী আমাকে একটা টেবিল ল্যাম্প উপহার দিয়েছেন, সেই ল্যাম্পে পড়ব বলে আমার নিজের জন্য একটা বই কিনতে এসেছি।'

এই গাঁজাখুরি গল্প শুনে সভায় সেকি করতালি কিন্তু মোটা ভদ্রলোক তাতে দমিত হলেন না, এবং অতঃপর যা বললেন সেটা তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব। তিনি বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে যে, 'আমি নিশ্চয় করে জানি ওই মহিলা এই আগরতলা বইমেলাতেও এসেছেন। তাঁকে অনুরোধ আপনার টেবিল ল্যাম্পের জন্যে বই কিনতে ভুলবেন না।'

অতিরিক্ত ব্যাপার ঘটল এর পরের দিন। চটুল কথা হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ওড়ে। স্থূল ভদ্রলোকের খ্যাতি কি এক বাঁকাপথে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। উপাচার্য মহোদয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্, হয়ত বা নিজের কৌতূহল মেটাতেই তিনি মোটা ভদ্রলোককে পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এলেন।

আবার এখানেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সভায় সেই মাননীয় তথ্যমন্ত্রী উপস্থিত। আসলে তথ্যমন্ত্রী মহোদয় বোধহয় একটু দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তিনিই এই মোটা মানুষটিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখানে আসার পর থেকে তাঁর ভাবগতিক দেখে, কথাবার্তা শুনে তিনি নিরন্তর আশঙ্কায় রয়েছেন, কোথায় কখন কি যে হয়ে যায়। কি করে ফেলবে কি জানি।

তবে বিশেষ কিছু হল না। দেখা গেল, এখানে কেউ কেউ আসা থেকেই এই আগন্তুককে সম্যক চেনে এবং মোটামুটি ধারণাও আছে। আগন্তুক কি যেন বুঝে বেশি গদ্য কপচাবার মধ্যে না গিয়ে তিনটি কবিতা পাঠ করলেন।

ওই দিনই বিকেলে মোটা মানুষটিকে যেতে হয়েছিল আগরতলা বেতার কেন্দ্রে একটি সাক্ষাৎকার দিতে। বেতার কেন্দ্রের তরুণ বার্তা সম্পাদক প্রবল উৎসাহী, তিনি সাক্ষাৎকারের আগে মোটা মানুষটিকে বললেন, 'আপনার সরস গল্পগুলো ভারি মজার, আমি ভাবছি এর কিছু কিছু ইংরেজিতে অনুবাদ করলো কেমন হয়? বার্তা সম্পাদকের প্রস্তাব শুনে আগন্তুক আঁতকিয়ে উঠলেন, হাত জোড় করে বললেন, 'তোমরা আমার

এত বড় সর্বনাশ করতে যেও না। আমার রুটি-রুজি মেরো না।' বার্তা সম্পাদক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে?' আগন্তুক বললেন, 'মানে আর কি? আমার সব লেখা যে ইংরাজি থেকে টোকা। অনুবাদ করলেই ধরা পড়ে যাব।'

আগরতলাকে মোটা মানুষটির কেমন যেন ভাললেগে গিয়েছিল। অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া দেশের গন্ধ জল-মাটি-বাতাসে, রাস্তাঘাটে মানুষজন গত জন্মের ভাষায় কথা বলছে। কেমন দেশ-দেশ, আত্মীয়-আত্মীয় ভাব।

মোটা মানুষটি ভাবছিলেন, আরও দু-চারদিন থেকে গেলে হয়। এমন সময় তিনি খবর পেলেন কলকাতা থেকে স্বয়ং নগরপাল আগামীকাল আসছেন। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হল না তাঁকে ঠেকাতেই (কিংবা ঠেঙাতেই) নগরপালকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সুতরাং আর দেরি নয়। পরের দিন সকালেই পাত্তাড়ি গুটিয়ে মোটা মানুষটি সোজা বিমানবন্দরে। এবং দুর্ভাগ্য মানুষটির যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেখানেই বাঘের ভয়। একেবারে নগরপালের মুখোমুখি। নগরপালকে কঠিন হওয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজের হাতের ঝোলাটি দেখিয়ে তিনি ভীতকণ্ঠে নগরপালকে বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

সরস কবিতা

কিছুদিন আগে জলাঞ্জলিতে কুমারেশ ঘোষের কথা লিখেছি। কুমারেশবাবু কয়েকটি সরস সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, 'সেকালীন শ্রেষ্ঠ কবিতা।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েক বছর আগে এ ধরনের সংকলন প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে অবশ্য সেকাল-একাল সব যুগেরই কবিতা ছিল। বইটির নামকরণ হয়েছিল 'রঙিন কবিতা।' এই বইটির বিজ্ঞাপন আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার কারণ হয়েছিল। এই বইটির বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম লেখা আছে, দাশরথি রায় থেকে তারাপদ রায়ের সরস কবিতা।'

বাংলা সরস কবিতার ভাণ্ডার অতি বিশাল। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে হাস্যরসকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে। করুণ রস কিংবা রৌদ্ররসের মতই হাস্যরসকে নবরসের অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই হাস্যরসের উত্তরাধিকার বাংলা কাব্য সাহিত্যেও ঘটেছে।

সুরসিক বাঙালি কবির কোনদিন অভাব হয়নি। বাংলা কবিতাতেও তাই সরসতার অভাব ঘটেনি। চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব কবিতা, ভারতচন্দ্র থেকে দাশরথি রায়-পাঠক একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই সরস অংশগুলো নজরে আসবে।

চর্যাপদেই তো বলা হয়েছে সেই দুগ্ধবতী কাছিমের কথা, যাকে দুয়ে দুয়ে পাত্রে আর দুধ ধরছে না। এর পরের পঙক্তিতেই কুমির গাছের তেঁতুল খাচ্ছে। এবং অতঃপর সবচেয়ে মারাত্মক কপট নিদ্রিত গৃহবধূর অন্তর্বাস চোরে নিয়ে নিচ্ছে।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতায়, বৈষ্ণব কাব্যে হাস্যরসের সঞ্চার করা হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই আদিরসের সাহায্য নিয়ে। সর্বত্র শ্লীল-অশ্লীলের সীমানা রক্ষিত হয়নি। জলাঞ্জলির এই ঘরোয়া কলমে এই বিষয়ে আলোচনায় যাওয়া সমীচীন হবে না।

বরং সপ্তদশ শতকের ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে যাই। শুধু সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পরই নয়, বাঙালরা হেনস্থা হয়ে আসছেন বহুকাল ধরে। একজন ভুক্তভোগী বাঙাল হিসেবে আমার সামান্য জীবনে আমিও কম দুর্ভোগী নই। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙাল নিধিরামের কথা লিখেছিলেন। গান লেখা হয়েছিল বাঙাল নিয়ে, 'বাঙাল বলিয়া...' যাতে সেই বিখ্যাত পঙক্তি ছিল, 'আমি ঢাকার বাঙাল নই।' কিন্তু এসবের ঢের আগে, তিনশ' বছরেরও বেশি আগে, ক্ষেমানন্দ লিখেছিলেন.

'...শিরে হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল।
জনমের মত ভাই হইনু কাঙাল ॥'

বাঙালের কথা হল, এবার এক বারেন্দ্রের কথা বলি। অষ্টাদশ শতকের কবি জীবন

মৈত্র, বেশ আধুনিক নাম। তিনিও মনসামঙ্গল লিখেছিলেন। মনসামঙ্গলের ছকে শিব-দুর্গার কোন্দল একটা বাঁধা বিষয় ছিল। জীবন মৈত্রের শিব-দুর্গার কোন্দল অতি উত্তম রচনা, রীতিমত জীবন্ত। শিবের ভাং চুরি গেছে, কৌপীন হারিয়ে গেছে, এমন কি ভাং ঘোঁটার লাঠিটি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। শিবদুর্গার ওপর রাগারাগি করছেন, 'আর ইহার দুইটা বেটা হইয়াছে মোর কাল,' অর্থাৎ 'আমার কাল হয়েছে এর দুটি ছেলে।' গণেশের ইঁদুর শিবের ভিক্ষার ঝুলি কেটে দিয়েছে। কার্তিকের ময়ূর শিবের সাপ ধরে ধরে খাচ্ছে। অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা।

এই স্বল্প পরিসর রচনায় ভারতচন্দ্রে কিংবা দাশরথি রায়ে যাব না। তাঁদের সরসতার কথা লিখতে গেলে সাত কাহন হয়ে যাবে। বরং কাছাকাছি চলে আসি। প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ করি,

'যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এ' 'বি' শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।...
...সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবে, দেখতে পাবে'...

বেশি উদ্ধৃতি দিতে গেলে রচনার স্থান সঙ্কুলান হবে। আপাতত বঙ্কিমচন্দ্র ছুঁয়ে একটু সামনের দিকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এগিয়ে যাব।

কুমারেশ ঘোষ তাঁর সঙ্কলনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অধঃপতন সঙ্গীত' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সঙ্গীতে বঙ্কিম উনিশ শতকের বাগানবাড়ি কালচারকে এক হাত নিয়েছেন। এই কবিতাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে, রাঙা সাজ পেসোয়াজ পরশিবে অঙ্গে', এবং 'ঠুসে মদ্য লও সাথে, যেন না ফুরায় রাতে,...খাদ্য লও বাছা-বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা, চপ সুপ-কারি-কোর্মা করিবে বিচিত্র।' কারণ,

'বাঙালির দেহরত্ন
ইহারে করিও যত্ন
সহস্র পাদুকা-স্পর্শে হয়েছে পবিত্র।'

এবার সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেতে হবে। অন্য সব কিছুর মতই অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের রসবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কথাও ভাবতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেমনটি চাই তেমন হয় না' থেকে স্মরণ করা যাক,

'আমি চাই স্ত্রী হয় রূপেগুণে অগ্রগণ্যা, অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না ; চাই বেশির ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।'

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ। কোন ভূমিকার, কোন ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। মাত্র চার পঙক্তি স্মরণ করা যায়, 'পরিণয় মঙ্গলে,' তিনি নববধূকে পরামর্শ দিয়েছেন,

'পাক প্রণালীর মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মত যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা।'

হাস্যরূপেন সংস্থিতা

এক ভদ্রলোক অফিসের কাজেকর্মে মোটেই সুবিধের ছিলেন না। একদিন তিনি অফিস ছুটির অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এসেছেন।

শরীর-টরির খারাপ হয়েছে কিনা এই ভেবে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগো, তুমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ি এলে কি করে?'

স্বামী বললেন, 'অফিসে একটা ফাইল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বড়বাবু আমাকে ধমকাতে লাগলেন। খুব জরুরি ফাইল, আমার কাছেই ছিল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাই অফিসের ফাইল খুঁজতে বাড়ি চলে এলে এই অবেলায়?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। ঠিক তা নয়। ফাইলটা খুঁজে না পাওয়ায় বড়বাবু খেপে গিয়ে বললেন, 'তুমি একটা উজবুক। তুমি জাহান্নামে যাও।' তাই বাড়ি চলে এলাম।'

অফিসে বড়বাবু খেপেছিলেন, এবার স্ত্রীও খেপলেন, মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'বাড়িটা বুঝি জাহান্নাম?'

পুজোর ছুটির আগে কলকাতায় নিউ মার্কেটে পাশের গলির পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কয়েকটা বিলিতি জোকবুক কিনেছিলাম। আমার পাঠক-পাঠিকারা জানেন এবং আমারও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বছরের পর বছর রসিকতা করতে করতে আমার রসকষ সবই শুকিয়ে গেছে, এখন আমার প্রাণান্ত অবস্থা। ফলে ওই বিলিতি বইগুলিই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্প বেছে নিয়ে নিজের বুদ্ধি ও ভাষামত সেগুলোকে বাংলায় পরিবেশন করি।

শারদীয় অবকাশে ওই বইগুলি থেকেই কয়েকটা টাটকা গল্প বেছেছি। জলাঞ্জলির পাঠকদের প্রতি এটাই আমার শারদীয় শুভেচ্ছা।

অতঃপর দ্বিতীয় গল্প। এর বিষয়বস্তু অবশ্য প্রাচীন। সেই সনাতন বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের বিবাদের কাহিনী।

বাড়িওয়ালি দোতলায় থাকেন। একতলায় ভাড়াটে। ভাড়াটের কয়লার উনুনে আঁচ দিলে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বাড়িওয়ালির শোয়ার ঘরে ঢোকে, তাঁর আবার হাঁপানি। এদিকে বাড়িওয়ালি দোতলার তারে ভেজা শাড়ি মেলে দিলে টপটপ করে জলের ফোঁটা ভাড়াটের উঠোনে, কখনও কখনও তাঁর টাকমাথায় পড়ে। এদিকে তাঁর আবার সর্দির ধাত।

এই যেমন হয় আর কি। সবাই এসব ঘটনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

সে যা হোক, একবার ঘটনা চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। চিৎকার, চেঁচামেচি, গালাগাল।

শেষকালে বাড়িওয়ালি দোতলা থেকে এক গামলা গরম ফ্যান ভাড়াটের মাথায় ঢেলে দিলেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, তবুও পুরো রক্ষা হল না, টাকে দুটো ফোসকা পড়ে গেল।

ব্যাপারটা ফৌজদারি আদালত পর্যন্ত গড়াল। দুই পক্ষ জেরায় জেরায় জেরবার। অবশেষে ক্লান্ত বিচারক বাড়িওয়ালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওপর থেকে গরম ফ্যান ঢেলেছিলেন?'

বাড়িওয়ালি বললেন, 'ফ্যান ঢেলেছিলাম, কিন্তু তত গরম ছিল না। দোতলা থেকে একতলায় পড়লে কি ফ্যান গরম থাকে?'

এই তর্কে প্রবেশ না করে বিচারক বললেন, 'কেন ঢাললেন?'

বাড়িওয়ালি বললেন, 'উনি আমাকে খুব খারাপ গালাগাল দিচ্ছিলেন।'

বিচারক বললেন, 'কি গালাগাল?'

বাড়িওয়ালি বললেন, 'সে খুব নোংরা গালাগাল। কোন ভদ্রলোককে তা বলা যাবে না।' এই বলে তিনি থমকিয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর উকিল থামবার পাত্র নন। তিনি বাড়িওয়ালিকে বললেন, 'আপনি তা হলে হুজুরের কানে কানে বলুন।'

যে কথা কোন ভদ্রলোককে বলা যায় না, সে কথা হুজুরকে কানে কানে বলার নির্দেশ শুধু উকিলবাবুরাই দিতে পারেন। এরপরে সে মামলার পরিণতি কি হয়েছিল আমার জোকবুকে সেটা লেখা নেই। তবে এই যথেষ্ট।

যা দেবী সর্বভূতেষু
হাস্যরূপেন সংস্থিতা।

মহাজ্ঞানী-মহাজন

এতদিন অনেক ছেঁদো কথাবার্তা হল। এবার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করি। একটা মহাজ্ঞানী-মহাজন প্রসঙ্গে যাই। তবে দিশি মহাজনে ব্যাপারটা তেমন মানাবে না, এবার আমরা সহেব-সুবো নিয়ে কারবার করব।

বিষয় যখন হালকা, তখন মার্ক টোয়েনকে দিয়ে আরম্ভ করা সঙ্গত হবে। দেখা যাক, সততার মত একটি অতি পবিত্র ব্যাপার সম্পর্কে তিনি কি বলেন।

মার্ক টোয়েন সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত সততা বিষয়ে বাল্যস্মৃতি থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। হুবহু অনুবাদে ঘটনাটি এই রকম।

'বালক বয়সে একদিন আমি রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার চোখে পড়ল একটি তরমুজের গাড়ি। আমি খুব তরমুজ ভালবাসতাম। আমি গোপনে গাড়িটির পিছনে গিয়ে একটি তরমুজ তুলে নিয়ে এক ছুটে পাশের গালিতে ঢুকে গেলাম। তরমুজটায় দাঁত বসাতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। আমি দৌড়ে তরমুজের গাড়িটার পেছনে আবার চলে গিয়ে হাতের তরমুজটা গাড়িতে নামিয়ে রাখলাম। তারপর গাড়ি থেকে অন্য একটা তরমুজ তুলে নিলাম, আরও বড়, আরও বেশি পাকা।'

লেখকের পরে রাজনীতিবিদের কথায় আসি। চার্লস দ্য গল এবং উইনস্টন চার্চিল, দু'জনেই রাজনৈতিক এবং সমর নায়ক ছিলেন। দু'জনেই মিত্রপক্ষের কিন্তু মতের মিল কদাচিত হত।

দ্য গল চার্চিল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'উনি যখনই কোন ভুল করেন, খেপে যান। আবার যখন আমি বুঝি আমিই সঠিক, আমিও অবশ্যই খেপে যাই। ফলে মুশকিলটা হয়েছে কি, আমি আর চার্চিল দু'জনেই দু'জনার ওপর প্রায় সময়েই খেপে থাকি।'

চমৎকার আত্মবিশ্লেষণ!

কিন্তু এর চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মবিশ্বাস। শ্রীমতী আইনস্টাইনকে তাঁর স্বামীর বিলেটিভিটি থিয়োরি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, 'এই থিয়োরিটি কতটা নির্ভরযোগ্য?' শ্রীমতী নিঃসংশয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আমার স্বামীকে ভালই জানি, আপনারা তাঁর ওপরে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন।'

এই রচনায় বাক্যবাগীশ অসকার ওয়াইল্ডকে বাদ দেওয়া উচিত হবে না। তীক্ষ্ণধী লেখক ছিলেন, তিনি, সুবিখ্যাত।

একদা তাঁর একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার প্রথম দিনে তিনি হলে গিয়ে দেখেন, দর্শক সংখ্যা খুব কম। হল প্রায় খালি পড়ে আছে। নাটকটিও আহামরি কিছু নয়, চলনসই।

নাটকটি দেখে তিনি ক্লাবে গেলে তাঁকে তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা জিজ্ঞাসা করেন, 'নাটকটি কেমন হয়েছে।'

ওয়াইল্ড তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চাপা হাসি হেসে বললেন, 'নাটকটি উতরিয়ে গেছে কিন্তু দর্শকরা উতরোতে পারেনি।'

বাকচাতুর্য একটা সহজাত ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই বা চেষ্টা করলেই সেটা আয়ত্ত করা যায় না। এর সঙ্গে বিদ্যা বা বুদ্ধির, ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

সম্প্রতি বিশেষ খ্যাতনাম্নী পুরস্কার ভূষিতা এক হলিউডি চিত্রতারকা মাত্র কয়েক বছর আগেও বিক্রয়বালিকা বা সেলস গার্ল ছিলেন। সেটাও সামান্য ফিরিওয়ালির কাজ। বিমানবন্দরের লাউঞ্জে আজানুলম্বিত স্কার্ট পরে, মাথায় লেবেল লাগান টুপি দিয়ে কোন একটি ট্রে নিয়ে সিগারেট বেচতেন। ঠিক তাঁরই পাশে তাঁর সঙ্গিনী ট্রলিতে করে তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ইত্যাদি ফিরি করেন।

আজকাল মার্কিন দেশের সর্বত্র শোয়া-বসার সব জায়গা দু'ভাগে বিভক্ত স্মোকিং এবং নন-স্মোকিং, ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের ভিন্ন করা হয়েছে। লাউঞ্জের সেই অধূমপায়ী এলাকায় পশারিণী তাঁর সিগারেট বেচছিলেন। এক রসিক ক্রেতা তাঁকে নন-স্মোকিং সাইনটা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে সিগারেট বেচছেন, এখানে সিগারেট খাওয়া যায়?' এর উত্তরে বিক্রয়বালিকাটির সপ্রতিভা প্রশ্ন ছিল, 'এই তো আমার সঙ্গিনী সাবান, তোয়ালে বেচছেন, আপনি এখানে সাবান মেখে তোয়ালে পরে স্নান করতে পারবেন?'

অবশেষে অধিকতর বিপজ্জনক একটি সাহেব শিশুর প্রশ্নে যাই।

শিশু : বাবা, বাবারা কি সব সময় তাদের ছেলেদের চেয়ে বেশি বোঝে?

শিশুর বাবা : হ্যাঁ।

শিশু : বাবা, স্টিম ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেছিলেন?

শিশুর বাবা : কেন ? তুমি জান না? জেমস ওয়াট।

শিশু : বাবা পেনিসিলিন কে আবিষ্কার করেছিলেন?

শিশুর বাবা : সে কি, ফ্লেমিংয়ের নাম জান না?

শিশু : বাবা, ওয়াট কিংবা ফ্লেমিংয়ের বাবা কেন স্টিম ইঞ্জিন বা পেনিসিলিন আবিষ্কার করতে পারল না?

এই শিশুটিকেই নাকি একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বল তো, সেক্সপিয়ার কে?' শিশুটির ইস্কুলে প্রতিবছর বড়দিনের ছুটির আগে সেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয় হত। বুদ্ধিমান সাহেব বাচ্চা জবাব দিয়েছিল, 'কেন, যে ভদ্রলোক অনেক বছর আমাদের ইস্কুলের জন্য নাটক লিখে দেন।'

আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে

একান্ত কলমে এই বয়েসে আর কার কথা লিখবো? এতকাল পরে তবে তার কথাই লিখি। আমার সই বাল্যসখী পদ্যরানীর কথা।

শক্তি বলতো পদ্য। পদ্যরানীর ভালোবাসা সে খুব পেয়েছিলো। অত ভালবাসা তার সইল না।

আমার, পদ্যরানীর ছোটখাট ভালোবাসার লোকেরা সব সময়ে তাকে পদ্য ডাক-নামে ডাকতে সাহস পাই না, কেমন সঙ্কোচ হয়, একটু ভয় ভয় করে। আমরা বলি কবিতা, শ্রীমতী কবিতা। আবার কখনো সম্ভ্রম করে শ্রীলা শ্রীযুক্তেশ্বরী বাক্যসুন্দরী ঠাকুরানি। কখনো বা পদ্যবেগম সাহেবা। সেই কতকাল হয়ে গেলো। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। এই সজ্ঞান মর জীবনের প্রায় সব সময়টাই তার সঙ্গে ওঠাবসা, চলাফেরা।

না। শোয়া হয়নি। অতটা সাহস হয়নি। একটু দূর থেকে পদ্যরানীর চরণপদ্মের ভজনা করেছি। তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' নয়, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'অজ-আম-ইট' নয়, সমতল ছায়াচ্ছন্ন মধ্যবঙ্গের এক গঞ্জ শহরের পাঠশালায় আমাদের শৈশব ছন্দের শুরু কর-কর, খর-খর দিয়ে। এবং সেখানেই শেষ নয় তারও পরে গর-গর, ঘর-ঘর।

এইভাবে বছর শেষে একদা রাত্রি শেষ হলো। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ পাঠ শেষ। আমি ওয়ান থেকে টুতে উঠলাম। আমার বয়েস সাকুল্যে ছয়। পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, সেই আমার পদ্যরানীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

সুন্দর নির্মল প্রভাত কাল, কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটেছে। পদ্যরানীর সঙ্গে সেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

আভাসে-ইঙ্গিতে আর দশজনেরই মতো তার ছোঁয়া পেয়েছিলাম ঘুম পাড়ানি ছড়ায়, যখন সে ঘুমসুন্দরীর সঙ্গে দত্তপাড়া দিয়ে চলে যেতো। তাকে আর পেয়েছিলাম রূপকথায়, দিদিমার মুখে, সাত ভাই চম্পা জাগো রে, পারুল বোনের সঙ্গে পদ্যরানীও ভাইদের ডাকতো। কে জাগে, লালকমল জাগে, নীলকমল জাগে, লালকমল আর নীলকমল জাগে, রূপকথার সেই প্রসাদে লালকমল আর নীলকমলের পাশাপাশি পদ্যরানীও জেগে থাকতো।

আমার শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের বছরে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করলেন। সেই ছয় সাত বৎসর বয়েসে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি শোকগাঁথা লিখেছিলাম, এখনো স্পষ্ট মনে আছে, সেই কবিতায় বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে দুঃখের প্লাবনের মিল দেয়া ছিল। শহর-গঞ্জের অনেক পত্র-পত্রিকায় অনেক মাস্টারমশায়, বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখনো এ ধরনের

কবিতা লিখে থাকেন। সুতরাং পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পরে আজ আর সেই শিশুটিকে দোষ দেয়া উচিত হবে না।

অবশ্য এই আমার প্রথম পদ্যভজনা নয়। মহাকবিদের মত যথারীতি সন্ধ্যাসঙ্গীত দিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলাম, ভাবা যায়, বিশ্বাস করা যায় সেই অস্ফুট শৈশবে 'তাই-তাই-তাই, মামার বাড়ি যাই', নয়; এমনকি 'আমসত্ত্ব দুধেতে ফেলি' নয়। আমি লিখেছিলাম

এখন হয়েছে সন্ধ্যা
ফুটেছে রজনীগন্ধা
আর ফুটেছে সন্ধ্যামলতী

আমার শৈশব প্রতিভার কথা আরেকটু বলি। আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব আসেজন বসেজন অধ্যুষিত বিশাল দোমহলা বাড়িতে অগুন্তি পুষ্যি ছিলো, তার মধ্যে অনেকগুলি ছিলো কুকুর ও বেড়াল। এর মধ্যে সাদা বেড়ালদের সাহেবি নাম দেওয়া হতো লিঙ্গ নির্বিচারে। শুধু সাহেবি নাম নয়, এই সব বেড়ালদের সাধ্য কবিনামে ভূষিত করা হতো। বিভিন্ন বেড়ালের নাম ছিলো সেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলি ইত্যাদি।

বেড়ালেরা অমর নয়। আমার বাল্যকালেই এরা একে একে পরলোক গমন করে। দুয়েকটি পালিয়েও যায়। ঐ বয়েসেই এই বেড়ালদের উদ্দেশ্যে আমি একটি মর্মস্পর্শী পদ্যরচনা করেছিলাম :

'সেক্সপীয়ার বায়রন,
মিল্টন, শেলি (ওরে) তোরা সব কোথায় চলে গেলি।'

বলা বাহুল্য, আমার শৈশবের এই কাব্যসাধনা বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র অনেক কিছু লিখেছি। সুতরাং বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক।

পদ্যদেবীর যতই ভজনা করে থাকি কবি হওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে। রীতিমত ধস্তাধস্তি করে।

আধুনিক কবিতার কায়দা-টেকনিক কিছুই জানতাম না। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে মফঃস্বল থেকে এই শহর কলকাতায় এসে মাথায় ভূত চাপলো কবিতা ছাপাতে হবে। দুহাতে কবিতা লিখতে লাগলাম।

নিজের কবিতা পড়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সে কি কবিতা লেখার ধূম। রাতদিন বুকে বালিশ চাপা দিয়ে কাব্যরচনা করে যাচ্ছি, সম্বল অকূল উচ্ছ্বাস আর বিপুল আবেগ।

খবরের কাগজের স্টলে যে পত্রিকা দেখছি, উলটে পালটে সেই পত্রিকার ঠিকানা দেশে মনে মনে মুখস্থ করে ফেলছি। বাসায় ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে খামে ঠিকানা লিখে দেদার কবিতা পাঠাচ্ছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কখনো নিজে হাতে দিয়ে আসছি, কখনো ডাকে পাঠাচ্ছি।

কোনো বাছ-বিচার নেই। রামকৃষ্ণ মঠের উদ্বোধন থেকে সে যুগের রসাল সিনেমা পত্রিকা সুধাংশু বক্সীর রূপাঞ্জলি কিংবা প্রবেশিকা। কিছুই বাদ যায়নি।

সবই পণ্ডশ্রম ছিলো। একটি অক্ষরও কোথাও ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি।

মনে আছে, প্রথম যখন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হলো তিনি তখন 'দেশ'

পত্রিকার কবিতা বাছাই করেন। নীরেন্দ্রনাথ আমার নাম শুনে বলেছিলেন, 'আপনার নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।' আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'সেটা অস্বাভাবিক নয়। গত ছয় মাসে আমার অন্তত একশোটা কবিতা আপনি অমনোনীত করেছেন।'

তখন আমি থাকি কালীঘাটে। সন্ধ্যার দিকে মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমার পরণে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর কালো হাতকাটা গেঞ্জি। হঠাৎ সুমার্জিত ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সুবেশ এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে এক বন্ধু বললেন, 'মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।' মানে পরিচয় পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক কবি মঙ্গলাচরণ।

আমি মঙ্গলাচরণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে দেখে একটু ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। ঐ পোশাক, তার ওপরে মারকুটে চেহারা---আমাকে দেখে তিনি বোধহয় উঠতি গুণ্ডা ভেবেছিলেন।

আমি তাঁকে দেখে বলেছিলাম, 'আমার একটা কবিতা সামনের সংখ্যা পরিচয়ে ছাপা হবে।' মঙ্গলাচরণ একটু চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বাভাবিক প্রশ্ন, 'কি নাম যেন আপনার?' আমি বলেছিলাম, 'কবি তারাপদ রায়।'

সামান্য ভেবে নিয়ে মঙ্গলাচরণ তখন বলেছিলেন, 'কই আপনার কোনো কবিতা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

আমি বলেছিলাম, 'একটু দাঁড়ান, বাসা থেকে ভালো দেখে একটা কবিতা এনে দিচ্ছি।' মঙ্গলাচরণ অবশ্য আর দাঁড়াননি, তবে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সময়ে পিছন ফিরে ঘুরে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

পদ্যসুন্দরী বারম্বার আমার দিকে তাকিয়ে আমার আচার-আচরণ দেখে মুচকি মুচকি হেসেছেন। আমার অক্ষম কলমে সেই মুচকি হাসি আমি যথাসাধ্য ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সারা জীবনের রচনায়। তাঁকে নিয়ে আমি অনেক রঙ্গতামাসা করেছি। যখন যেমন পেরেছি তেমনভাবে তাঁর আহ্বান করেছি। এই সূত্রে এই **একান্ত কলমের** ইতি টানছি আমার একটি কবিতার কয়েক পংক্তি দিয়ে,

কয়েকটি শব্দের পায়ের শব্দ
ক্রমশ এগিয়ে আসছে।
বুঝতে পারছি, পদ্যবেগম আসছেন।
সালাম, বেগম সাহেবা, সালাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নজরুল-সজনীকান্তের পরে এবার দ্বিজেন্দ্রলাল, বাংলার ঘরে ঘরে একদা যিনি ডি এল রায় নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর গান, তাঁর নাটক এই শতকের গোড়ার দিকে বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছিল। তাঁর নাটক আজকাল আর তেমন জনপ্রিয় নয়, বিশেষ অভিনীত হয় না। কিন্তু তাঁর গান, যা দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে সুপরিচিত এখনও বাঙালির কণ্ঠ থেকে হারিয়ে যায়নি। অতুলপ্রসাদের, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রগীতি এখনও জনপ্রিয়।

সজনীকান্ত-নজরুলের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথকে এনে ফেললাম কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের আগের যুগের, তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক।

একদা দ্বিজেন্দ্রলাল বিখ্যাত ছিলেন 'হাসির গানের রাজা' হিসেবে। গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপনে সেই কথাই লিখত।

ডি এল রায়ের হাসির গান ছিল ব্যঙ্গপ্রধান, তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন সমাজপতিরা, বিখ্যাত বাঙালিরা, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিলক্ষণ পড়েন।

সমবয়সী, জগদ্বিখ্যাত বিশ্বকবির প্রতি তাঁর একটা চাপা আক্রোশ ছিল, সেটা এতদিন পরেও বোঝা যায়। এ নিয়ে অনেক আলোচনা-গবেষণাও হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল সরাসরি বিবেকানন্দকেও আক্রমণ করেছেন। সেই শিকাগো বক্তৃতার যুগে 'নতুন কিছু করো' গানে বিবেকানন্দ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্রোক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে-

...'নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো,
কিম্বা সবাই ওঠো টাউন হলে জোটো,
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকা ছোটো।'

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন বিলিতি দ্রব্যের পিকেটিং চলছে দোকানে-দোকানে, বাজারে বাজারে স্তূপকার করে বিলিতি কাপড় পোড়ান হচ্ছে, সেই সময়েও দ্বিজেন্দ্রলাল সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তিনি লিখলেন--,

...'কেউ বা খাসা নিজের থলে ভরে নিলো,
দেশের নামে সবায়ে দিয়ে ধাপ্পা।
কেউ বা খাসা দু'পয়সা বেশ করে নিলো,
বিদেশীয়ে দিয়ে 'দেশী ছাপ্পা।'

বাঙালি হিন্দুর গীতাভক্তিকেও এক হাত নিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। গীতাই সব, গীতাই মোক্ষ। গীতার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বসংসারের সব প্রশ্নের উত্তর। দ্বিজেন্দ্রলালের অমোঘ ব্যঙ্গ থেকে গীতাভক্তি রক্ষা পায়নি :-

-'করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দমা, সয়ে যাবে,
গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা।
গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি
বেঁচে থাকুক গীতা আমার, গীতায় মরে আছি।'

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথা লিখতে গিয়ে 'চণ্ডীচরণ' নামে ব্যঙ্গ কবিতার উল্লেখ না করা অনুচিত হবে।

চণ্ডীচরণ একজন ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা, ধর্মের ব্যাখ্যাকার। যথারীতি যে-কোন শাস্ত্রকারের মত তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা সোজা বিষয়কে দুর্বোধ্য করে ফেলার। তবে তাঁর শ্রোতাদের তাঁর সম্পর্কে কি দারণা সেটা বারবার কোরাসে গীত নিচে উদ্ধৃত দুই পংক্তি থেকেই স্পষ্ট—

—'সবাই বললে হাঃ হাঃ হাঃ
লিখছে বেশ হাঃ হাঃ হাঃ।
যা হোক তোরা নিজের ঘটিবাটি সামলা।'

দ্বিজেন্দ্রলাল সৃষ্ট আরেকটি জীব নসীরাম পালের বিষয় আবার স্ত্রী-স্বাধীনতা।। নসীরাম পালের বক্তৃতায় রয়েছে-

...'স্ত্রীজাতিকে ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যাহা গরুটাকে হরি নামটি শিক্ষা দেওয়াও তাহা।...

...স্ত্রীদের বাক্যালাপটি শুধু স্বামীর সঙ্গেই সাজে স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শুধু রান্নাঘরের মাঝে।'...

নিজের এই সমস্ত ব্যঙ্গ কবিতার ফলাফল সম্বন্ধে, জনমত বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাই অবশেষে তাঁকে বলতে হয়েছিল--

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুধু নকলে।

গাধাঘোড়া

প্রথমেই সমস্যা দাঁড়িয়েছে, গাধাঘোড়া, নাকি ঘোড়াগাধা?

গাধাঘোড়া, মানে গাধা এবং ঘোড়া, দ্বন্দ্ব সমাস। তবে দ্বন্দ্ব দাঁড়িয়েছে গাধা ও ঘোড়ার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। গাধা আগে, না ঘোড়া আগে?

হাতিঘোড়ায় হাতি আগে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই সুবাদে ঘোড়াগাধাই হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। গাধাঘোড়াও চমৎকার চলছে।

সে যা হোক, সেকালের মাস্টারমশায়েরা বিশেষ করে পণ্ডিতমশায়েরা অনেক গাধা কিংবা ঘোড়াকে পিটিয়ে মানুষ করেছেন, অন্তত তাঁরা তাই দাবি করতেন।

একালের শিশু মনস্তত্ত্ববিদেরা কিন্তু পেটানর ঘোর বিপক্ষে; তাঁদের বক্তব্য হল, পিটিয়ে মানব শিশুদের গাধা বানান যেতে পারে, মানুষ করা যাবে না।

ঘোড়ার বুদ্ধি, বীরত্ব ও প্রভুভক্তির অজস্র গল্প আছে। ইতিহাসের পাতায় বিশ্ববিশ্রুত বীরপুরুষদের নামের সঙ্গে তাঁদের ঘোড়ার নামও স্থান পেয়েছেন। দু'-একটি ঘোড়ার ছবিও আছে।

কিছু কিছু ঘোড়ার ছবি আজও খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে মুদ্রিত হয়। সে অবশ্য ঘোড়দৌড়ের দৌলতে। এমন অনেক জুয়াড়ি আছেন, যিনি তাঁর নিজের পিতামহের নাম জানেন না, কিন্তু রেসকোর্সের আজকের বাজির ঘোড়ার চৌদ্দপুরুষের নাম জানেন।

এদিক থেকে গাধা ঘোড়ার ধারে কাছে আসে না। গাধার কোন নামই রাখা হয় না। শুধু একবার পরশুরামের গল্পে ধোপার এক বৃদ্ধা গর্দভীর কথা পড়েছিলাম, যার নাম ছিল বোধ হয় সৌরভী। সেই সৌরভীকে এক খেয়ালি বর্ণবিশারদ রঙ করে পদ্মকোরকবর্ণা করে দিয়েছিলেন।

গাধারা খুব বোকা হয়। বোকা হওয়াই তাদের নিয়ম। মানুষও বোকা হলে গর্দভ হয়।

মানুষ নয়, এক প্রকৃত বোকা গর্দভের কথা বলি। পুরনো হলেও বেশ ভাল গল্প।

এক ধোপার এক বেতো গাধা ছিল। সেই গাধাটি বিশেষ বোঝাটোঝা বহন করতে পারত না। আর ধোপাও রেগে গাধাটাকে বেধড়ক মারধর করত।

দুপুরে মাঠে ঘাস খাওয়ার সময় এলাকার অন্য গরু-গাধারা বলত, 'তুমি ওখানে এত মার খেয়ে থাকছ কেন? তুমি ওই ধোপার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাও। এ কাজ করে লাভ কি? কি উন্নতি হবে তোমার?'

গাধাটি সাধারণত চুপ করে থাকত, কিন্তু একদিন মুখ ফসকিয়ে মনের কথাটা বলে ফেলল, 'কাজটা আমি সহজে ছাড়ছি না। এখানে আমার একটা ভাল প্রসপেক্ট আছে।'

গাধার এই কথা শুনে সেই মাঠের যত গরু-গাধা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, 'কি ব্যাপার? ধোপার কাপড় টানার কাজে আবার কি প্রসপেক্ট থাকতে পারে?'

এইবার গাধা যা বলল তার সারমর্ম এই--

ধোপার একটি কিশোরী মেয়ে আছে। সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তবে মোটেই লেখাপড়ায় ভাল নয়, অলস। তা ছাড়া মাথায়ও সারবস্তু বিশেষ কিছু নেই।

সেই মেয়েটি বাৎসরক পরীক্ষায় পরপর দু'বার ফেল করেছে। গাধা নিজের কানে শুনেছে, ধোপা তার মেয়েকে ধমকাচ্ছে, 'যদি তুই এবারও ফেল করিস, তা হলে তোকে পাঠশালা ছাড়িয়ে এই গাধাটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।'

এই কথা শোনার পর থেকে গাধাটি অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, কবে মেয়েটি আবার পরীক্ষায় ফেল করবে এবং তার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হবে।

গাধা বিষয়ে আরেকটা অসামান্য গল্প জানি। তবে মনে করতে পারছি না, এই জলাঞ্জলির পাতাতে সে গল্পটি ইতিমধ্যে লিখেছি কিনা।

তবে আমি তো অকুতোভয়ে (মানে কানকাটা) না হয় আবার বলি।

কলকাতা থেকে মফস্বল শহরে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক যুবক বেড়াতে গেছেন। সেখানে শ্বশুরবাড়িতে নানা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

যুবকটি বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। একটা মাঠের ধারে রাস্তায় হাঁটছেন। সেই মাঠের কাছে-দূরে দুটো গাধা চরছে।

শিশুপুত্রটি কলকাতায় জন্মেছে, এর আগে গাধা দেখেনি। প্রথমে সামনের গাধাটি দেখতে পেয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এটা কি?' বাবা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'গাধা'।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গাধাটি কাছে এসেছে এবং পুত্রের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেটি একটি মেয়ে গাধা, আকারে একটু ছোট।

পুত্রটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এটা?'

বাবা বললেন, 'এটা ওই গাধার বউ।'

পুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, গাধারাও বিয়ে করে?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ খোকা। শুধু গাধারাই বিয়ে করে।'

অবাক কাণ্ড

'গুইননেস বুক অফ রেকর্ডস', একটি জগদ্বিখ্যাত বই। এই বইটির নাম জানেন না এমন শিক্ষিত লোক বিরল। এই পৃথিবীতে রেকর্ড ভঙ্গকারী যা কিছু ঘটনা ও কাজ, যা কিছু বিশালতম এমনকি ক্ষুদ্রতম সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সেগুলির বাৎসরিক পঞ্জী এই গ্রন্থ।

কে কবে কোথায় সবচেয়ে লম্বা লাভ দিয়েছিল, সবচেয়ে জোরে দৌড়েছিল, কোন্ দেশে কোন্ মানুষ সকলের চেয়ে দীর্ঘজীবী এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিবরণ রয়েছে।

এমন কি পৃথিবীতে সবচেয়ে লম্বা গোঁফ কার আছে, কার হাতের নখ দীর্ঘতম, কে ক্ষুদ্রতম হরফে একটি ক্ষুদ্র বস্তুর পিঠে হাজার শব্দ লিখতে পারে ইত্যাদি উল্‌টোপাল্‌টা, বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ভরপুর এই বই।

এই বইয়ের পৃষ্ঠায় নিজের নাম তোলার অধীর আগ্রহে লোকে ঝুড়ি ভর্তি কাঁচা পেঁয়াজ চিবিয়ে খায়, এক পায়ে দিনের পর দিন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে সবরকম মানুষের মধ্যে নিজেকে অনন্য করে তোলার যে আগ্রহ রয়েছে 'গুইননেস বুক অফ রেকর্ড' তাতে ইন্ধন যোগায়। গুইননেস বুক অফ রেকর্ডস যাঁরা প্রণয়ন করেন তাঁরা সম্প্রতি অন্য একটি বিচিত্র গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন। বইটি গত মাসে (জুলাই ১৯৯৫) লণ্ডন শহরে প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'গুইননেস বুক অফ অডিটিস'।

অডিটিস বা অদ্ভুত ঘটনার বই। বলা বাহুল্য বুক অফ রেকর্ডেও অদ্ভুত ঘটনা কিছু কম ছিল না। কিন্তু এটা একটু অন্য ধরনের সঙ্কলন।

মূলত ঐতিহাসিক চরিত্র, রাজারাজড়ার কাণ্ড কারখানা, বিভিন্ন দেশের গোলমেলে ও হাস্যকর আইন সেই সঙ্গে আরও হাজার রকম অবাক কাণ্ডের সংক্ষিপ্ত অথচ সত্য ঘটনাই এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

যেমন প্রথমেই একটা উদাহরণ নেয়া যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইলিনয় রাজ্যের কার্কল্যাণ্ডে একটি বিধি রয়েছে, শহরের ওপর দিয়ে কোন মৌমাছি উড়ে যেতে পারবে না। আইন তো রয়েছে কিন্তু মৌমাছিরা কি এই আইন জানে, তারা কি এই আইন মানে?

গুইননেসের এই সঙ্কলনে দেখা যায় মার্কিন দেশের বহু রাজ্যে এর চেয়ে আরও অনেক হাস্যকর বিধি আছে। কোন কালে কোন কারণে হয়ত বিধিটি বিলের প্রয়োজনে রচনা করা হয়েছিল, এখন আর মানেটা পরিষ্কার নয়।

আরও তিনটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

(এক) কেনটাকি রাজ্যের লেক্সিংটনে পকেটে করে আইসক্রিম বহন বেআইনি।

(দুই) নেব্রাসকা রাজ্যের ওয়াটারলুতে নাপিতদের রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ।

(তিন) মিলওয়াকিতে হাতি পুষতে গেলে তাকে গলায় বকলস দিয়ে শিকল দিয়ে না রাখলে আইন ভঙ্গ হবে।

আইনের প্রসঙ্গ থেকে এবার রাজারাজড়ার কাহিনীতে যাই।

ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ একদা চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামেন এবং পথের পাশের একটি গাছের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেন। পরে জানা গিয়েছিল যে, তিনি ভেবেছিলেন যে ওই গাছটি প্রুশিয়ার রাজা এবং তাই ভেবেই তিনি গাছটির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

আবিসিনিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় মেনলেক অন্য রকম একটা গোলমাল করেছিলেন। আমেরিকায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মারা হয়। এই চেয়ারের কথা শুনে সম্রাট দ্বিতীয় মেনলেক কেন যেন খুব উত্তেজিত হয়ে তিনটি বৈদ্যুতিক চেয়ার নিউইয়র্ক থেকে আবিসিনিয়ায় নিয়ে আসেন।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে তখনও আবিসিনিয়ায় বিদ্যুৎ আসেনি। সেই চেয়ারগুলি ব্যবহারের কোন সুযোগই ছিল না।

মহামান্য সম্রাট এতে মোটেই দমে যাননি। তিনটির মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক চেয়ার তিনি নিজের কাজে লাগালেন, সিংহাসন হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

ফ্রান্সের ষষ্ঠ চার্লসের মনে একটা ধারণা ঢুকেছিল যে, তাঁর শরীর কাচের তৈরি। তাই তিনি কখনও গাড়িতে উঠতে চাইতেন না। যদি ঝাঁকুনিতে তার শরীর গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়।

অবিশ্বাস্য সব ঐতিহাসিক তথ্য চমকপ্রদ সব ঘটনা, অকল্পনীয় বিধি নিয়ম 'গুইননেস বুক অফ অডিটি' যদি বুক অফ রেকর্ডের মতই জনপ্রিয় হয়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভারী ভারী সংবাদের চাপে ক্লান্ত মানুষ এই বইয়ে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য পাবে। এই একঘেয়েমির যুগে বৈচিত্র্যের মূল্যই বা কম কি!

যাহা পাই, তাহা চাই না

সৈকত আর মধুময় এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা করত। দু'জনের মধ্যে যেমন ভাব ছিল, তেমন ঝগড়াঝাঁটিও ছিল। তবে উঁচু ক্লাসে উঠতে দেখা গেল সৈকত মধুময়ের চেয়ে অনেক ভাল ছাত্র। সৈকত তরতর করে উঁচু ক্লাসে উঠে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে স্কুল পেরিয়ে গেল। মধুময় কিন্তু সেই স্কুলের গণ্ডিতেই আটকিয়ে রইল।

তদবধি মধুময়ের বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে মধুময়ের বাবা শ্যামময় সৈকতকে দুই চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর স্থির ধারণা সৈকত মধুময়ের চেয়ে অনেক মাঠো, সে কোন চালাকি করে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে।

এদিকে সৈকত কিন্তু অত্যন্ত ভালভাবে বি এ, এম এ পাশ করে গেল। মধুময় বহু কষ্টে তৃতীয় কি চতুর্থ বারে মাধ্যমিক তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে আর পড়াশুনো করলে না। করার কথাও নয়। আর কি পড়াশোনা করবে, সে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল।

সৈকতও চাকরির চেষ্টা করছে দুয়েকটা পরীক্ষা-টরিক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদি দিয়ে সে একটা-চাকরি পেয়েও গেল।

এ কথায় মধুময়দের বাসায় পৌঁছাতে শ্যামময় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন, 'এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। ওই গাধা ছেলে সৈকত ও আবার কি চাকরি পাবে?' তারপর একটু চুপ করে থেকে গজরাতে গজরাতে বললেন, 'দেখিস, এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-ফেটার আসবে না।'

সত্যিই কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কুরিয়রের পিয়ন এসে নিয়োগপত্র দিয়ে গেল। সে খবর শ্যামময়ের কাছে পৌঁছতে তিনি বললেন, 'ওসব ভুয়ো এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ওটা নিয়ে বোকা চাকরিতে জয়েন করতে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবে।'

বলাবাহুল্য, সেরকম কিছু কিন্তু হল না। সৈকত চাকরিতে যোগদান করে বহাল তবিয়তে বাস করতে লাগল। এমনকি একদিন মধুময় নিজেও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার অফিসে গিয়ে কাজের জায়গা দেখে এল।

এ খবর মধুময় এসে তার বাপকে বলতে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তারপর শ্যামময় ভবিষ্যৎবাণী করলেন, 'ও সব বিনি মাইনের কাজ, দেখিস মাইনে-টাইনে পাবে না।'

পরের মাসের পয়লা তারিখে কিন্তু সৈকত অফিসের অন্যদের মতই মাইনে পেল। মাইনে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা যখন সৈকত বাসায় এল তখন তাদের বাসায় মধুময়ও রয়েছে। মধুময় সরল প্রকৃতির লোক, তাকে আগের দিন সৈকত বলেছিল, কাল সন্ধ্যেবেলা

আসিস। কাল মাইনে পাব, দুজনে মিলে সন্ধ্যাবেলা আমিনিয়ায় গিয়ে পরটা আর মটন রেজালা খাব।'

সন্ধ্যার বেশ পরে পুরনো সুহৃদের পয়সায় মটন রেজালা খেয়ে খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মধুময় বাড়ি ফিরল। শ্যামময় তখন বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন। বাপকে দেখে মধুময় বলল, সৈকত কিন্তু আজ মাইনে পেয়েছে।'

শ্যামময় দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জানলে কি করে?'

আমিনিয়ায় খাওয়ার কথা না বলে মধুময় বলল, 'আমি দেখেছি। ও যখন বাড়ি ফিরে মাইনের টাকা ওর মাকে দেয় আমি সেখানে ছিলাম। দেখলাম অনেকগুলো টাকা, তার মধ্যে অন্তত চার-পাঁচটা পাঁচশো টাকার নোট'।

'পাঁচশো টাকার নোট?' শ্যামময় এবার যেন আশ্বস্ত হলেন, 'ওসব জালি, দু'নম্বরি নোট। কাগজে দেখিসনি, পাঁচশো টাকার নোট সব জাল। ওসব নোট ভাঙাতে গেলেই তোমার বোকা বন্ধুটি পুলিশের হাতে পড়বে। জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে, তা কম করেও অন্তত পাঁচ বছর।'

পাঠক, শ্যামময়বাবুকে আপনি ভালই চেনেন। তিনি আপনার পাশের বাড়িতে থাকেন। হয়তো আপনার অফিসেই কাজ করেন। কখন কখন আয়নার মধ্যেও তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তখন অবশ্য চিনতে পারেন না।

অতঃপর এই নিবন্ধের দীর্ঘ নামকরণটি একটু খেয়াল করুন।

'শুনেছি সোনার গাঁ, গিয়ে দেখি শুধুই মাটি', এই অমূল্য পংক্তিটি আমার রচনা নয়, এটি ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি প্রাচীন প্রবাদ।

সোনার গাঁ ছিল দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ঈশা খাঁর রাজধানী, পরবর্তীকালের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত। এই নামে অবশ্য আধুনিক ঢাকা শহরে একটি পাঁচতারার হোটেল হয়েছে।

সে যা হোক, আমাদের এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার। সোনার গ্রাম শুনে এসেছিলাম, এসে দেখছি সোনা নয় মাটি।

বাঙালির চিরকালীন খুঁত ধরা স্বভাবের সঙ্গে এই প্রবচনটি চমৎকার মানিয়ে গেছে।

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে বিশ্বকাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে এই প্রবচনটি মনে পড়ল। তবে সেই ছোটবেলায় শুনেছিলাম এখনো দেখছি ভুলিনি।

ইডেন উদ্যানে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমরা কি কি আশা করেছিলাম?

(এক) সর্বাপেক্ষা প্রচারধন্যা খ্যাতনাম্নী বঙ্গ দুহিতা শ্রীমতী সুস্মিতা সেন আকাশ থেকে স্বর্গের অপ্সরার মত আসরে নেমে আসবেন হেলিকপ্টারের দড়ির মই বেয়ে।

অতি অবাস্তব বাসনা। সুস্মিতা সেন কেন বোম্বাইয়ের কোন এক নম্বর মহিলা ডামিও একাজ করতে সাহস পাবে না।

তা ছাড়া অঘটন যদি কিছু ঘটতো? সুস্মিতা যদি পড়ে যেতেন। তাঁকে চিকিৎসা করা হত। প্রাণে বেঁচে থাকলে খঞ্জ ও পঙ্গু, থ্যাঁতা ঠোঁট, ফাটা নাক বিশ্বসুন্দরীকে নিয়ে বিশাল ঝামেলা ছিল। সুস্মিতা সেন যে সাহস করেননি তার কারণ তিনি বুদ্ধিমতী।

(দুই) অ্যালিসা চিনয় চারদিকে ঘুরে ঘুরে গাইবেন 'মেড ইন ইণ্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া'।

না। তিনি আসেননি। সম্ভবত তাঁর আসার কথা ছিল না। তবে ঘুরে ফিরে অ্যালিসা চিনয়ের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' বেজেছে, যে গান রাস্তার মোড়ে পুজো মণ্ডপে, পানের দোকানে গত মরশুমে বেজে বেজে আমাদের কানের পোকা বার করে দিয়েছে।

(তৃতীয়) আনন্দ শঙ্করের আত্মত্যাগ। উদয় শঙ্কর-অমলা শঙ্করের ছেলে, রবি শঙ্করের ভাইপো এমনকি শ্রীমতী মমতা শঙ্করের দাদা যার রক্তে শোম্যানসিপ রয়েছে, সে এমনভাবে নিজেকে জবাই হতে দিল।

এবং শুধু নিজে একা নয়, সস্ত্রীক।

(চার) সৈয়দ জাফরির অতুল কীর্তি। এ সম্পর্কে এই নিবন্ধের শেষে কিছু বলেছি। এখানে সংক্ষেপে বলি, যে ভদ্রলোক এ্যামনেশিয়ায় ভুগছেন, যিনি পানপরাগ নামক সুপুরি মশলার বিজ্ঞাপনে মুখোজ্জ্বল করে দেখা দেন, যাঁর নত্ব-যত্ব জ্ঞান নেই, তিনি কেন এখানে।

এ কাজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনেক ভাল করতে পারতেন। অন্যথায় অপর্ণা সেন। সেটা এই শহরের পক্ষে অনেক বেশি মানানসই, সম্মানজনক হত। এরকম কেলেঙ্কারিও হত না।

(পাঁচ) চন্দননগর বনাম ইতালি।

এই মধ্যেই ভুলে গেলাম। কি নাম যেন সেই রোম্যানের। 'লুঠে-নে-দাদা' কিংবা এইরকম, বিলিতি নাম আবার আমার মনে থাকে না।

ডালমিয়া সাহেব দেশে বা বিদেশে ইংরেজি ইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন। বাংলা ইস্কুলে লেখাপড়া করলে তাঁকে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি পড়তে হত, যার আরম্ভই হয়েছিল।

'বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস'....দিয়ে।

বাংলা ইস্কুলে পড়লে সবসময়ে যে ক্ষতি হয় তা নয়। অন্তত এ ক্ষেত্রে ডালমিয়া সাহেবের উপকার হত, তাঁর জানা থাকত মাঘ মাসে শীতের বাতাস বয়।

'ফ্রান্সের বাজি'র অবশ্য নিন্দ করা যাচ্ছে না। তবে দু'জনে বলাবলি করছে হাওড়া-বালির বুড়িমার বাজির কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগের দুই সপ্তাহ নাকি ওভারটাইম কাজ করেছে।

আর নিন্দা-মন্দ বাড়িয়ে লাভ নেই। থাকলে সেই সোনার গাঁয়ের ব্যাপার।

প্রত্যাশা ছিল সোনার, এসে দেখলাম মাটি। একেবারে প্রকৃত অর্থে মাটি, অনুষ্ঠানটাই মাটি করে গেল।

তবে এরকম ঘটনা কিন্তু এই প্রথম নয়। কলকাতায় এ জাতীয় কেলেঙ্কারি আগেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এবং আমরা প্রত্যেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করব কোথায় কি ত্রুটি, কার কতটুক দোষ। আমাদের মনে হবে আগেকার দিনে এরকম কিছু হত না।

তখন সবই ঠিকটাক হত। যা দোষত্রুটি সবই এখনকার সময়ের। এই সূত্রে গল্পটা বলি।

সেদিন এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে দুই পরস্পর পরিচিত বৃদ্ধের মধ্যে কথাবার্তা শুনছিলাম।

প্রথম বৃদ্ধ দ্বিতীয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খগেনদা, আপনি নরকে বিশ্বাস করেন?'

খগেন নামধারী সেই দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন, 'দ্যাখো নগেন, বয়েস বেড়েছে, বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে ওই নরক-ফরক বুজরুকিতে বিশ্বাস করতে বলো না।'

নগেন বললেন, 'তা হলে আমাদের অল্প বয়েসে যেসব ভাল জিনিস ছিল, সেসব গেল কোথায়?'

খগেনবাবু এ কথা শুনে বললেন, 'নগেন মনে হচ্ছে তোমার কথাটা খুব ফেলনা নয়। সবই তো দেখছি জাহান্নামে গেছে। জাহান্নাম না থাকলে গেল কি করে।'

এর পরে দুই বুড়ো বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুর নিন্দায় মুখর হলেন। তার মধ্যে ইডেনের অনুষ্ঠান যেমন আছে, তেমনিই হাওলার মামলা।

সব সময়ে যে আমরা সব কিছুর নিন্দায় মুখর হই, তা কিন্তু নয়। নিঃশব্দ নিন্দাও আছে, সে খুবই উচ্চবর্ণের আর্ট।

আমার এক খুল্লমাতামহের কাহিনী মনে আছে। তিনি একটা বিলিতি সওদাগরি অফিসে কাজ করতেন, সেই অফিসের কাজ শুরু হত সকাল নটায়। তিনিই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আগে খেয়ে অফিসে বেরোতেন। নিঃশব্দে খেয়ে যেতেন, কোন দিন রান্নাবান্না নিয়ে কাউকে কিছু বলতেন না।

একদিন তিনি খেয়ে অফিস চলে গেছেন। তারপর অন্যেরা খেতে বসেছে। তরকারি দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়েই একজন বলল 'কাকিমা, তরকারিতে নুন দাওনি?'

কাকিমা মানে আমার খুল্লমাতামহী অন্য একজন ভোজনকারীকে দিয়ে যাচাই করে নিলেন এবং তারপর নিশ্চিত হলেন যে সত্যিই ব্যঞ্জনে নুন দেওয়া হয়নি। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'শয়তান।'

এই স্বগতোক্তিটি তাঁর স্বামীর সম্পর্কে, যিনি একটু আগে নিঃশব্দে ওই নুন ছাড়া তরকারি অম্লানমুখে খেয়ে গেছেন এবং একবারই নুন না হওয়ার ব্যাপারটা জানান দেননি।

এ ধরনের নীরব সমালোচনা করার যোগ্য প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। আমাদের সকলের সেটা নেই বলেই আমরা চেঁচামেচি করে গলা ফাটাই, তিক্ত সমালোচনা করি।

নীরব সমালোচনার পরে নিরপেক্ষ সমালোচনা। এ ব্যাপারটা আরও বেশি গোলমেলে।

সম্প্রতি আমার বাড়িতে আমার এক বহু দিনের পুরনো বন্ধু এসেছিলেন। তাঁর মত বিশ্বনিন্দুকে আমার এই ষাট বছর বয়েসের জীবনে দ্বিতীয়টি আর দেখলাম না। এবার তিনি অনেকদিন পরে এসেছেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর জিবের ধার, তাঁর চিন্তার বক্রতা এখন একটু কমেনি।

বলাবাহুল্য তিনি এবার এসেই ওই বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে পড়লেন, 'সৈয়দ জাফরি একটা অগা।'

বন্ধুকে উসকিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি বললাম, 'এই সৈয়দ জাফরি লোকটা কে?'

বন্ধুটি এবার কামান দাগবার সুযোগ পেলেন, বললেন, 'তাও জানিস না, খুব বড় ফুটবলার ছিল। ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক টিমের হয়ে লণ্ডন অপিলিম্পিকে কানাডার বিরুদ্ধে গোল করেছিল।'

আর নয়, এবার থামাতে হয়। বাধ্য হয়ে আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি শুনেছিলাম সৈয়দ জাফরি হলিউডের ফিল্মস্টার।'

বন্ধু এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মুখমন্ত্রী যদি গভর্নর হতে পারেন, ফিল্মস্টার ফুটবলার হতে পারে না?'

বাজে তর্ক করে লাভ নেই। আমি বন্ধুকে বোঝালাম এ বয়েসে আর অত উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। বরং আমরা ঠাণ্ডা মাথায়, নিরপেক্ষভাবে যদি সব বিচার করি।'

বন্ধু বললেন, 'নিরপেক্ষ? কিন্তু সকলের আগে ঠিক করতে হবে কিসের পক্ষে নিরপেক্ষ হব আর কিসের বিপক্ষে নিরপেক্ষ হব।'

পক্ষ বিপক্ষ থাকলে আর নিরপেক্ষ হবে কি করে? এ কথাটা বন্ধুকে বোঝাতে পারলাম না।

ফুল

বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' গানে লিখেছিলেন, 'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনিং, সুখদাং বরদাং মাতরম্।' সে অনেকদিন আগের কথা। সে এক স্বপ্ন ও জাগরণের, জীবন ও পুনরুজ্জীবনের যুগ। সাহেবগণ, ফরাসী সাহেবগণ নিজের দেশে যাকে বলতেন রেনেসাঁ।

এই ফুল্ল থেকেই ফুল। অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। ভাষা বিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্যন্ত হাস্যকর ভুল করে ফেলেন।

সংস্কৃতি কাব্যে এবং সনাতন ধর্মগ্রন্থে অবশ্য ফুলের ছড়াছড়ি। সচন্দন গন্ধপুষ্প ছাড়া হিন্দুর ধর্মকর্ম অচল। আজকের ধর্মান্ধ ইরান-ইরাক একদিন ছিল খোলামেলা গোলাপের দেশ, মধ্যপ্রাচের প্রাচীন কবি একটা অতিরিক্ত পয়সা পেলে ফুল কেনার বাসনা পোষণ করতেন।

কাব্যে, শিল্পে, ধর্মে ফুলের ব্যবহার নিয়ে কোন আলোচনায় বসতে হলে বহু সময় ব্যয় করতে হবে। সে আলোচনা হয়তো মহাভারতের থেকেও বড় হয়ে যাবে। লোকাচার এবং দেশাচার, সব অঞ্চলে সব সংস্কৃতিতে ফুল অপরিহার্য। বোধহয় ফুলের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখেই কবি বলেছিলেন, অলকে কুসুম না দিও, শিথিল করবী বাঁধিও।

ফুল নিয়ে মানুষের সংস্কারও কিছু কম নয়। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্যে সাদা ফুল, শ্বেতকরবী, বেল বা জুঁই। বিবাহ উৎসবে রক্ত গোলাপের তোড়া।

সাদা ফুল ইউরোপ ও এশিয়ার চিনে, ভারতে শ্রদ্ধা সৌজন্যের প্রতীক। দক্ষিণ আমেরিকায় কিন্তু হলুদ বা বেগুনি ফুল ব্যবহার হয় শোক নিবেদন করার জন্যে। অন্যদিকে রাশিয়ায় হলুদ ফুল খুবই অসম্মানজনক, কাউকে বিশেষ করে কোন মহিলাকে উপহার দেওয়া অনুচিত। আর ফরাসী দেশে হলুদ রঙ ব্যভিচারের প্রতীক, সেখানে কাউকে একগুচ্ছ হলুদ ফুল উপহার দিলে বিপদ হতে পারে।

অবশ্য এই চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদের যুগে ফুলের মত কোমল এবং সুন্দর জিনিসও সন্দেহজনক। যে-কোন বর্ণের যে কোন গন্ধের ফুল, ফুলের মালা, তোড়া, এখন অবাঞ্ছিত হয়ে গেছে। রাজীব গান্ধী ফুলের মালা গ্রহণ করতে গিয়েই নিহত হলেন। আজকাল কোন সভাসমিতিতে, অনুষ্ঠানে কোন ভি. আই. পি.-কে ফুলের মালা, ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া নিষিদ্ধ। এমন কি তাঁদের বাড়িতেও ফুল পাঠালে বিশেষ পরীক্ষার পরেই সেটা প্রাপকের কাছে পৌঁছবে।

সে যা হোক, এসব কথা যাক। আমি জানি পাঠক-পাঠিকারা আমার কাছে নেহাৎ হালকা কিছু কথা শুনতে চান।

আপাতত সেই চেষ্টাই করা যাক।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় বলে একটা কথা আছে। কথাটার মানে হল ফুলের মত কোমল ও হালকা জিনিসের আঘাতও সহ্য করতে পারে না। সাধারণত ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করার জন্যে এই বাক্যটি ব্যবহার হয়।

কিন্তু এ নিয়ে একটি গল্পও আছে। গল্পটি আমি নিজেই আগে বলেছি, কিন্তু ফুলের রম্যরচনায় গল্পটিকে এড়ানো যাবে না।

সুবলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে অফিসে যেতে বন্ধুরা ধরল। 'কি হল কি করে মাথা ফাটল?' সুবল প্রথমে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা উত্তর দিতে হল।

সুবল বলল, 'ও কিছু নয়। বৌ ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল।' প্রশ্নকারীরা অবাক 'সে কি কথা, কি এমন ফুল, যা ছুঁড়ে মারলে কপাল ফেটে যায়, পাথরের ফুল নাকি?'

সুবল ম্লান হেসে বলল, 'তোমরা প্রায় ঠিকই ধরেছ। আমিও ঠিকই বলেছিলাম।'

সহকর্মীরা বলল, 'হেঁয়ালি করছ কেন? খুলেই বল না ব্যাপারটা?'

সুবল এবার খুলে বলল, 'বৌ সত্যিই ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু ফুলের সঙ্গে পাথরের ফুলদানিও ছিল। তারই চোটে মাথাটা কেটে গেল।'

ফুলের বিষয়ে আরও একটি মজার গল্প জানি। এটাও সাবেকি গল্প, তবে আরেকবার বলার মত গল্প।

গল্পটা গোলমেলে। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে।

জনৈকা নবীনা যুবতী বিকেলবেলা খুব সাজগোজ করেছে, চুলের খোঁপায় রঙিন ফুল গুঁজেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যুবতীটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে আর নিজের সৌন্দর্যসুধা নিজেই পান করছে।

যুবতীটির এহেন মোহিত অবস্থায় অকুস্থলে তার কনিষ্ঠা কিশোরী ভগিনীর প্রবেশ। কিশোরীটি বেশ অনেকক্ষণ ধরে দিদির সাজগোজ, বেশভূষা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল, তারপর সরল চিত্তে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, তোর চুলের খোঁপায় ওটা কি ফুল দিয়েছিস রে? ওটা কি গোলাপ?'

দিদি জবাব দিল, 'দেখতে পাচ্ছিস না এটা গোলাপফুল নয়। এটা ক্রিসেনথিমাম।'

'ক্রিসেনথিমাম' নামে যে কোন ফুল থাকতে পারে সেটা ছোট বোনের জানা ছিল না। শব্দটাও কেমন বিদঘুটে। স্বাভাবিকবাবেই সে দিদিকে প্রশ্ন করল, 'দিদি ক্রিসেনথিমাম বানান কি হবে রে?'

দিদি কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, '-ক-য়-ঋ ফলা না না বোধহয়, ক-য়-র-য় সংযুক্ত, হ্রস্ব ই; না না বোধহল দীর্ঘ ঈ..।' দিদি বানানে আর এগোতে পারল না। প্রথমেই আটকিয়ে গেল।

তারপর বানান বন্ধ রেখে, অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেমে, দিদি বলল, 'তুই প্রথমে ঠিক বলেছিলি। এটা হল গোলাপ। গয় ওকার গো, তার আকার লা আর প। গোলাপ।'

গোলাপের প্রসঙ্গ যখন এলই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গোলাপ' কবিতার প্রথম চার পংক্তি স্মরণ করি।

আমি ছিনু শোভাহীন নিঃস্ব মরুদেশে,
আমি ছিনু বাবলার সাথী,
প্রেমিক পথিক এসে মোরে ভালোবেসে
আমারে ফুটালে রাতারাতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ফুলের প্রকৃত প্রেমিক। ফুল নিয়ে এত কবিতা আর কেউ লেখেননি। তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই ফুলের উল্লেখ আছে। মহুয়া থেকে চম্পা, কুন্দ থেকে আকন্দ, এমনকি জাফরানের, আফিমের ফুল নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামই হল 'ফুলের ফসল।'

নানা রকম গ্রাম্য বন্য ফুলের কথা লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর গল্পে,উপন্যাসে, দিনলিপিতে। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও অচেনা, নাম-না জানা ফুলের ছড়াছড়ি। সেখানে ভেরেণ্ডা ফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে, সাদা দুধ ঝরে করবীর।

অবশেষে কবিদের জগৎ থেকে এবার বিজ্ঞানের পৃথিবীতে একবার আসি। আধুনিক কালে ফুলের বিষয়ে নানা রকম গবেষণা করা হয়েছে। সে সব গবেষণার ফলাফল অতি বিচিত্র।

অনেকদিন আগে এক দার্শনিক বলেছিলেন, ফুল হল ঈশ্বর যা কিছু রচনা করেছেন, তার মধ্যে মধুরতম কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ফুলের মধ্যে আত্মা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এই দার্শনিক বোধহয় ঠিক বলেন নি। গবেষণায় দেখা গেছে, ফুল মানুষের মতই শব্দদূষণ পছন্দ করে না। একটি ফুলদানিতে যদি একগুচ্ছ ফুল থাকে এবং সেই ফুলদানিটি থাকে খোলা জানলার ধারে, যার ওপারে সদ্যব্যস্ত, যানবাহনের শব্দে অস্থির একটি রাজপথ, কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে ফুলগুলি জানালার দিক থেকে আলগোছে মুখ সরিয়ে নিয়েছে, ঘরের ভিতরের দিকে মুখ করে আছে।

ফুলের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল পাওয়া গেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে গরমে সে কুঁকড়িয়ে যায়। ক্লোরোফর্ম দিলে একদম ঝিম মেরে যায়, এমনকি ফুলদানির জলে মদ মিশিয়ে দিলে পুষ্পগুচ্ছ মাতাল হয়ে ওঠে।

অবশেষে একটি মালা দিয়ে এই ফুল রচনা শেষ করি।

ফুল সে বৃক্ষশাখাতেই থাক, কিংবা পুষ্পপাত্রেই থাক, ঝুড়িতেই থাক, কিংবা ফুলদানিতেই থাক, ফুল সবচেয়ে ভাল দেখায় ফুলের মালায়। এই সূত্রে প্রবচন স্মরণ করি, সেখানে এই কথাটি চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে,

বাসনের মধ্যে থালা,
কুটুমের মধ্যে শালা,
ফুলের মধ্যে মালা।

ফাজিল কথামালা

ফাজিল শব্দটির মূল অর্থ বোধহয় উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত। পরে অর্থ দাঁড়িয়ে যায় অপ্রয়োজনীয় বা বাজে। পুরনো জমিদারি সেরেস্তায় ফাজিল খরচের খাতা ছিল।

শব্দটি আরবি, ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এখন ফাজিল মানে বোঝায় বাচাল বা বখাটে। তবে ফাজলেমি ঠিক বাচালতা নয়, এর মধ্যে কিঞ্চিত রসিকতার আভাসও আছে।

সে যা হোক, সম্প্রতি পুরনো বইয়ের দোকানে আমি একটি অসামান্য ইংরেজি বই পেয়েছি। যার বাংলা নামকরণ হতে পারে ফাজিল কথামালা। বইটি চমকপ্রদ কথোপকথনের একটি সুন্দর সংকলন।

বইটি ইংরেজিতে লেখা। সুতরাং গির্জা ও যাজক থাকবেনই। প্রথমে যাজকের গল্প দিয়ে শুরু করি।

এক ধর্মযাজক প্রথম এসেছেন এক শহরে। সেখানকার স্থানীয় গির্জায় একটি রবিবাসরীয় প্রর্থনাসভা পরিচালনা করার জন্য। তিনি শুনেছিলেন গির্জাটি রেল স্টেশন থেকে দূরে নয়, তাই ট্রেন থেকে নেমে কোনরকম যানবাহনের চেষ্টা না করে নিজেই পথে পা বাড়ালেন।

কিন্তু তিনি তো আর রাস্তাঘাট বিশেষ কিছু চেনেন না। তাই রাস্তায় বেরিয়ে একটি বালকের দেখা পেয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন, গির্জার রাস্তাটা কোন্ দিকে।

রবিবারের সকাল, বালকটি ছিপ হাতে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। সে এই শহরেরই ছেলে, রাস্তাঘাট ভালই চেনে। সে সঙ্গে সঙ্গে যাজককে গির্জার পথ দেখিয়ে দিল।

যাজক তখন বালককে বললেন, 'রবিবারের সকালে প্রার্থনা না করে মাছ ধরতে যাচ্ছ। এতে পাপ হয়, তুমি আমার সঙ্গে বরং গির্জায় এস, আমি তোমাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে দেব।'

বালকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি গির্জার পথই জানেন না, স্বর্গের পথ কি দেখাবেন?'

পরের গল্পটি এক গায়িকাকে নিয়ে। তিনি যে খুব ভাল গান করেন এমন কথা হলপ করে বলা যাবে না। একদিন এক গান গাওয়ার আসরে তিনি দুই বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। সে দিন সেই সঙ্গীতসভায় ভদ্রমহিলা দশ-বারোটি গান গাইলেন। বন্ধুদ্বয়ের অবস্থা প্রায় কাহিল।

অনুষ্ঠানের শেষে হল থেকে বেরতে বেরতে গায়িকা বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেমন শুনলে তোমরা আমার গান?'

প্রথম বন্ধুটি একটু ঠোঁটকাটা, তার ওপরে ঘণ্টা দেড়েক ধরে গানের অত্যাচার সহ্য

করে তাঁর মেজাজ গেছে বিগড়িয়ে। তিনি বললেন, 'ওই বেসুরো গলায় ভেউ-ভেউ চিৎকার, এ আবার গান নাকি?'

গায়িকার চোখ কপালে উঠল। দ্বিতীয় বন্ধুটি অগত্যা সামলানোর চেষ্টা করলেন, 'না না। ও কিন্তু নিজস্ব মত বলছে না। হলের সবাই এইরকম বলছিল, তাই ও বলছে। আমাদের তো ভালই...'

বলা বাহুল্য, সামলানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। বন্ধুদ্বয়কে পরিত্যাগ করে গায়িকা দ্রুত বিদায় নিলেন।

এর পরের কথোপকথনটি মর্মান্তিক, কিংবা নিষ্ঠুরও বলা যেতে পারে। তবে এই নিষ্ঠুরতা নিজেই নিজের ওপরে আরোপিত।

দিলীপবাবু বিপত্নীক ভদ্রলোক। একা একাই থাকেন। বয়স হয়েছে, তা প্রায় সত্তরের কাছাকাছি।

যেমন হয়, হয়ে থাকে, একদিন গভীর রাতে প্রচণ্ড বুকে ব্যথায়, ঘামতে ঘামতে তাঁর ঘুম ভাঙল। দিলীপবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কোনরকমে বিছানা থেকে উঠে টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে একটি নার্সিং হোমের ফোন নম্বর বার করে ডায়াল করলেন। একটু পরে ওপাশে একটি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠ শোনা গেল।

দিলীপবাবু তাঁকে বললেন, 'দেখুন আমার মনে হচ্ছে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। অবিলম্বে নার্সিং হোমে যাওয়া দরকার। আপনারা কি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে পারবেন?'

ওপাশের ভদ্রলোক, কোথায় থাকেন ইত্যাদি জেনে নিয়ে তারপর বললেন, 'ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন সিলিন্ডার সমেত অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াতে বাইশশো টাকা চার্জ হবে।'

শুনে কৃপণ দিলীপবাবু বললেন, 'শুনেছি হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে মাত্র আড়াইশশো টাকা লাগে। বরং আর একটু কষ্ট করে একবারে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতেই চলে যাব, অনেকগুলো টাকা বাঁচবে।'

দিনকাল খুব খারাপ

নিতান্ত অল্প বয়েসে, ভাল করে দাড়ি গোঁফ গজানোর আগে, সিগারেট খাওয়া শেখার আগে, কলকাতায় চলে এলাম কলেজে পড়তে।

শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে দেখি সামনের প্ল্যাটফর্মে ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে খদ্দরের ঝোলা ব্যাগ, হাতে মাইক, এলোমেলো চুলের যুবক জনতাকে জানাচ্ছেন, 'আজ এই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে...'।

সেই শুরু, তারপর প্রায় অর্ধেক শতক কেটে গেছে। এ শহরে বসবাস বাংলা আর ইংরেজি শতাব্দীর মাঝামাঝি শুরু করেছিলাম। বাংলা শতাব্দী কাবার হয়ে গেছে তিন বছর আগে, ইংরেজি শতাব্দী কাবার হতে আর তিন-চার বছর বাকি। কিন্তু 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ' এখনও কাটেনি। বড় দীর্ঘ এই মুহূর্তটি।

কলেজে থাকতে ছাত্র নেতাদের 'বক্তৃতা শুনে একদা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে একটা ট্রামে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেছিলাম। জামার কলার ধরে পেটাতে পেটাতে পুলিশ একটা জাল ঢাকা লরিতে তুলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে একটা অতি নির্জন জায়গায় ঘোর সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দিয়ে আসে। নামানোর আগে অবশ্য পকেটে টাকা পয়সা যা ছিল সব নিয়ে নেয়।

জনমানবশূন্য এবং যানবাহনহীন সেই তেপান্তর থেকে বহু কষ্টে উদ্ধার পেয়েছিলাম কিন্তু তারপর থেকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আর কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়িনি।

সন্ধিক্ষণ কিন্তু এখনও কাটেনি। মাঠ ময়দান থেকে দূরাগত মাইকে, পথ সভায়, অফিস কাছারিতে স্কোয়াড মিটিংয়ে এখনো 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ' চলছে। উনিশশো একান্ন সালে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে দেখা সেই লোকটির কোন পরিবর্তন হয়নি। পোশাক একটু বদলেছে, আজকাল কখনও কখনও তিনি ধোপ দুরস্ত ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরেন, কখনও বা প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট। মুখের বুলি কিন্তু বদল হয়নি, 'ইতিহাসের এই ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে...', যেন শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদৌল্লার ভাঙা রেকর্ড বাজছে, 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা।'

তবে এই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের চেয়ে আমাকে অনেক বেশি ভোগাচ্ছে সিজন চেঞ্জ। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ যেমন আমি উতরোতে পারিনি, তেমনি আমার জীবনের ঋতু বদলের শেষ নেই।

একদিন হেঁচে ফেলেছিলাম ইস্কুলের ক্লাশে। স্নেহশীল পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, 'একটু সাবধানে থেকে সিজন চেঞ্জের সময়। সেটা ছিল পুজোর ছুটির পরে। অল্পদিন পরে বাৎসরিক পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে জ্বরে পড়লাম, পাড়ার ডাক্তারবাবু আমাকে না দেখেই ওষুধ দিলেন, বললেন, 'এখন এরকম একটু হবে, সিজন চেঞ্জের সময়।'

সেই সময় মনে মনে ভেছেলাম, সিজনটা খুব লম্বা তো। কিন্তু সিজনটা কত লম্বা সেটা তখন টের পাইনি। আমার জীবনে সিজন চেঞ্জ হওয়া শেষ হল না।

গলা ব্যথা হয়েছে, মাফলার জড়িয়ে বাজারে গেছি. মাছওয়ালি বললেন, 'বাবুর ঠাণ্ডা লেগেছে, বায়ু পরিবর্তনের সময়।' ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় মাথাভার, অস্বস্তি, গৃহিণী ঘোষণা করলেন, 'সিজন বদলের সময়। এরকম একটু হবে, যাও আর দেরি না করে বাজারে যাও।'

কখনও বৈশাখ মাসে, কখনও আশ্বিনে, কখনও ভরা ভাদরে, কখন হু হু শীতে, দুরন্ত ফাল্গুনে। কখনও প্রতিবেশী কুঞ্জবাবু, কখনও সহকর্মিনী মনোরমা সেন, কখনও অনুজোপম একরাম আলি, কখনও ডাক্তারবাবু, কখনও বা কবিরাজমশায় আমার দুর্দশা দেখলেই ঘোষণা করেছেন, 'সিজন চেঞ্জের সময় ওরকম হয়।'

তা হোক, সিজন তো আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন চেঞ্জ হয়ে নতুন সিজন আসবে কি সে কবে? আর কবে?

এদিকে দিনকাল খুব খারাপ।

দিনকাল কি আজ থেকে খারাপ? সেও আমার সেই ছোটবেলা থেকে। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি, 'দিনকাল খুব খারাপ।'

আমার মার মামার বাড়ি ছিল আমাদের শহর থেকে মাইল বারো দূরের গ্রামে, সেই গ্রামের থেকে মায়ের এক মামা প্রায় নিয়মিতই কাজেকর্মে শহরে আসতেন। আমরা তাঁকে বলতাম প্রকাশদাদু।

প্রকাশদাদু খুব ভয় দেখাতে ভালবাসতেন। আমাদের বাসায় এসে দাঙ্গা, যুদ্ধ স্থানীয় হানাহানি-কাটা-কাটি চুরি-ডাকাতি এইসব নিয়ে আলোচনায় মত্ত হতেন। তারপর গ্রামে ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের মা-বাবাকে মানে তাঁর ভাগনি এবং ভাগনি জামাইকে নাম ধরে বলে যেতেন, 'জুটি, রেণু, খেয়াল রেখো দিনকাল খুব খারাপ। সাবধান খুব সাবধান।'

সেই প্রকাশদাদু বহুকাল পরলোকগত হয়েছেন. আমার মা-বাবাও নেই। কিন্তু দিনকাল এখনও খুব খারাপ।

আজ সকালেই লেখাটা লিখতে গিয়ে ব্যাপারটা আবার যাচাই করলাম। পরপর তিনজনকে ফোন করলাম, একজন কবি, একজন আমলা, একজন চিত্রতারকা। তিনজনকেই বললাম, 'দিনকাল খুব খারাপ।' তিনজনেই স্বীকার করল। এমন সময়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় এক সাইকেল-আরোহী এক পথচারীর গায়ে ধাক্কা দেওয়ায় দুর্ধর্ষ হাতাহাতি বেঁধে গেছে। এক আধচেনা ভদ্রলোক বাজার করে থলে হাতে ফিরছিলেন, তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'দিনকাল খুব খারাপ'।

জলাঞ্জলি
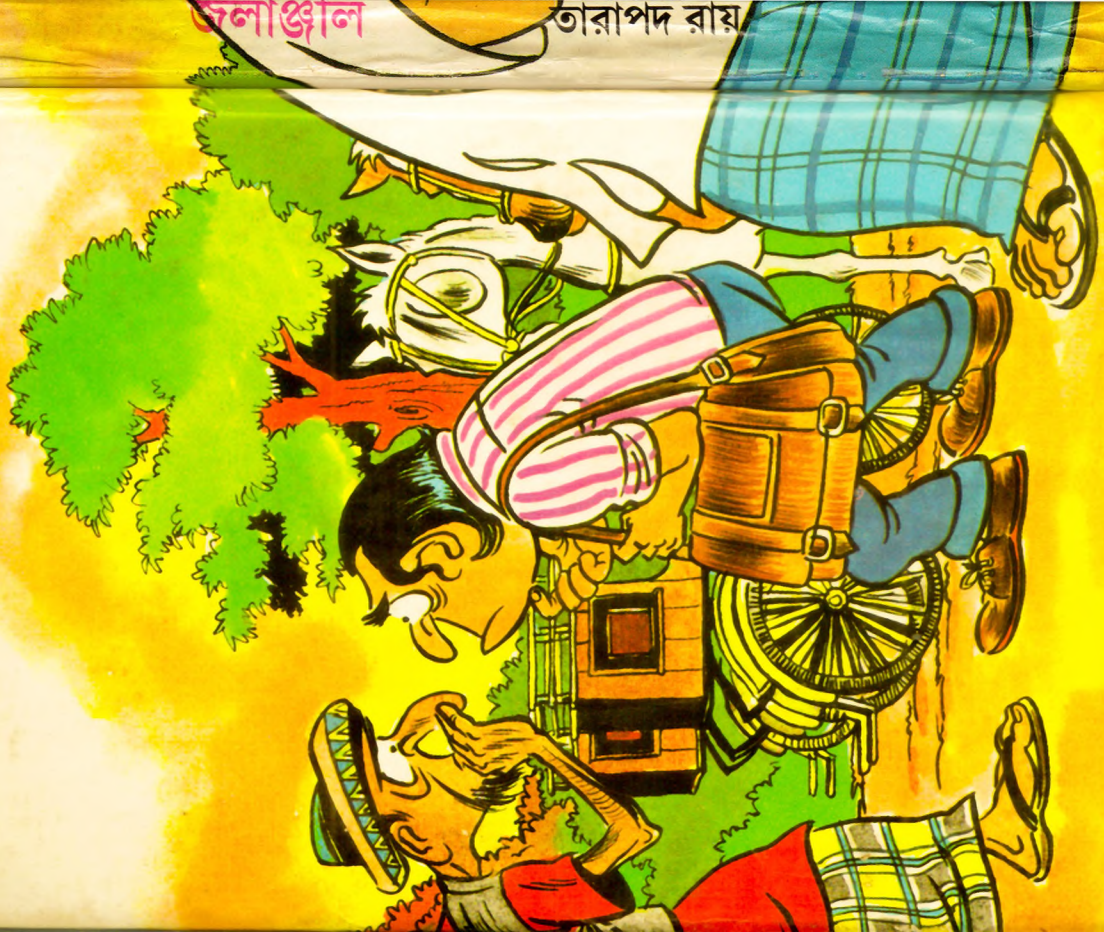
তারাপদ রায়